'প্রহেলিকা-সিরিজে'র ত্রয়োবিংশ গ্রন্থ

শ্রীঅনলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৫২

দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪. ঝামাপুকুর লেন, কলিকাত

৺ব্রজগোপাল সেনাপতির

স্মরণে—

অনল

শম্ভু নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার

রিভলভার বার করে সে গুলি করলো।

[পৃঃ—

রক্ত-তৃষ্ণা

এক

তখনও পদ্মাবক্ষে জাহাজ একঘেয়ে ঘর-ঘর শব্দ করতে-করতে নদীর শুভ্র সলিলকে গলিত রজতের ন্যায় দুই পাশে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণ বেগে অগ্রসর হচ্ছিল।

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা।

সূর্য্যদেব যেন তাঁর কর্ত্তব্য শেষ করে সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করবার জন্য নদীবক্ষে অবগাহনে নেমে যাচ্ছিলেন। সমস্ত আকাশকে কে যেন সিঁদূরে আবৃত করে দিয়েছে! একদল গাঙ্-শালিক কলরব করতে-করতে জাহাজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তারা যেন বলতে চায়,—আমরা মুক্ত, আমরা সুখী, আমরা স্বাধীন!

দেখতে-দেখতে দিগ্-দিগন্ত সন্ধ্যাদেবীর কৃষ্ণ কেশরাশিতে ঢেকে গেল। অদূরে দিগন্ত-পারে শুভ্র চন্দ্রমা হাসতে-হাসতে উদয় হলো। তার স্নিগ্ধ কিরণধারা নদীবক্ষে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করলো। দূরে মাঝি-মাল্লাদের আপনহারা ভাটিয়ালী গান সর্ব্ব-সাধারণের মনে আনন্দের সঞ্চার করছিল। এমনি সময় ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হরিহরবাবু প্রকৃতির আপন

হাতে-গড়া সৌন্দর্য্য দেখতে-দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন! সহসা ভৃত্য রহিমের ডাকে তাঁর চেতনা ফিরে এলো।

তিনি সচকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে! কি হয়েছে?"

—"এক ঘণ্টা পরেই গোয়ালন্দ ষ্টেশন। আপনি এখন চা খাবেন কি?"

—"হাঁ, খাব।" বলেই হরিহরবাবু কেবিনের দিকে এগিয়ে চল্লেন।

দেখতে-দেখতে গোয়ালন্দ ষ্টেশন এসে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রীদের নামবার তাড়াহুড়া পড়ে গেল। তিনিও ভৃত্যের হাতে স্যুট্‌কেশটি দিয়ে নেমে এলেন।

ষ্টেশনে ঢাকা-মেল অপেক্ষা করছিল। তিনি খুব তাড়াতাড়ি ছোট একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলেন। কিন্তু তিনি সেই ভিড়ের মধ্যেও দেখতে পেলেন জন-চারেক মুসলমান অতি সতর্কভাবে তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে পাশের কামরায় চেপে বসলো।

তিনি চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, "এরাই ত আমার সাথে নরায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে উঠেছিল! এরা কি তবে আমার গুপ্তধনের রহস্য জানতে পেরে আমার পিছু-পিছু ধাওয়া করেছে?

এরূপ কত সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন ভাবতে-ভাবতে তিনি রহিমের তৈরী বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত্রি প্রায় দেড়টা।

ট্রেণটি গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে ঝক্-ঝক্ শব্দ করতে-করতে উল্কার মতো ছুটে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর প্রভৃতিকে পেছনে ফেলে রেখে, সে যেন সর্ব্বাগ্রে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছুবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে!

সহসা খুট-খাট্ আওয়াজ শুনে হরিহরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারের মধ্যে তিনি দেখলেন, কে যেন তাঁর স্যুট্‌কেশ খুলবার চেষ্টা করছে!

হরিহরবাবুকে জাগতে দেখে সেই লোকটি ছোরা হাতে অতি সন্তর্পণে তার দিকে এগোতে লাগলো।

লোকটির পরণে একটি আপাদ-মস্তক ঢাকা কালো কাপড়। লম্বায় সে প্রায় ছয় ফুট।

তাকে দেখে হরিহরবাবু প্রথমে একটু দমে গেলেন; কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিজের দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলেন, তখন আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। এদিকে মুখোশধারী লোকটি তখন অতি কাছে এসে পড়েছিল। কাজেই তিনি দিগ্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন,—একটি ছোট-খাটো ধ্বস্তাধ্বস্তির সৃষ্টি হলো।

হরিহরবাবু সারাজীবন কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম করে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কাজেই এই মল্লযুদ্ধে তাঁরই জয় হলো। তিনি এক মুষ্ট্যাঘাতে অচেনা শত্রুকে ধরাশায়ী করে দিলেন। পরক্ষণেই তিনি দেখতে পেলেন, কে যেন

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল !

এই ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজে রহিমের ঘুম ভেঙে গেল। হরিহরবাবু স্যুটকেশ থেকে টর্চ্চ বের করে তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন ; কিন্তু তখন আর কোথাও কারও কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সে রাত্রে তাঁর আর ভাল ঘুম হলো না।

পরদিন সকালে ট্রেণ এসে শিয়ালদহ ষ্টেশনে থামলো। তিনি ট্রেণ হতে নেমেই দেখতে পেলেন, তাঁর পুত্র অজয় প্ল্যাটফর্ম্মের অপর প্রান্ত হতে তাঁরই দিকে ছুটে আসছে !

হরিহরবাবু হাসিমুখে পুত্রকে অভ্যর্থনা করলেন।

দুই

হরিহরবাবুর একমাত্র পুত্র অজয়। পিতা বহুদিন পরে কলকাতায় আসছেন খবর পেয়ে সে নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিল। পুত্রের সাহায্যে পিতা নির্ব্বিঘ্নে গৃহে পৌঁছুলেন।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর একটি পাকা দোতলা বাড়ী। হরিহরবাবুরা পুরুষানুক্রমে এই বাড়ীতেই বাস করছেন।

বাড়ীতে সবশুদ্ধ দশটি ঘর। নীচের তলায় ছয়টি, আর ওপরে চারটি। এই চারটির মধ্যে পূবদিকের শেষের ঘরখানি হরিহরবাবুর। ঘরটি বিলাতি আস্‌বাবপত্রে সাজান। হরিহর-বাবু যে একটু সৌখীন মানুষ, তা' এই ঘরখানা দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

বাড়ীর সম্মুখে ছোট একফালি জমি। তাতে নানা জাতীয় বিলাতি ও দেশী ফুলের চারা। বাগানের তত্ত্বাবধান করবার জন্য একটি উড়ে মালীও ছিল। হরিহরবাবুর সখের মধ্যে ছিল এই নিভৃত বাগানটিতে বসে কবিতা পাঠ করা ও নানাজাতীয় ফুল নিয়ে গবেষণা করা। তা ছাড়া, তিনি মাঝে-মাঝে নিজস্ব মোটরগাড়ি নিয়ে ইডেন-গার্ডেন, গড়ের মাঠ প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতেও যেতেন। কিন্তু এমন স্ফূর্ত্তিবাজ লোকটিকেও

ইদানীং দেখে মনে হয়, তিনি যেন কোন্ এক গভীর সমস্যায় বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছেন !

সেদিন ছিল শুক্রবার, বেলা তখন ছয়টা। হরিহরবাবু তাঁর ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন,—"আজ ইডেন-গার্ডেনের দিকে বেড়াতে যাব। গাড়ি বার কর।"

—"যে আজ্ঞে।"

দেখতে-দেখতে গাড়িখানি গগনস্পর্শী বিরাট অট্টালিকার সারি পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল।

এস্প্ল্যানেডের মোড় অতিক্রম করবার সময় সহসা হরিহর-বাবুর দৃষ্টি অপর একখানি গাড়ির ওপর পড়ল। পড়তেই তাঁর সর্ব্বাঙ্গ একটা অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠলো! তিনি দেখলেন যে, গাড়ির ওপর এখনো সেই আগেকার দেখা চারজন মুসলমানের মুখ! দেখেই মনে হলো, গাড়িখানি যেন তাঁর গাড়িকে বিশেষ ভাবে অনুসরণ করে আসছে!

দেখতে-দেখতে গাড়িটি তাঁর গাড়ির পেছনে এসে পড়লো, তিনিও তাঁর ড্রাইভারকে গাড়ি জোরে হাঁকাতে বললেন; কিন্তু তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই খামে মোড়া একখানি চিঠি তাঁর কোলের ওপর এসে পড়লো।

তিনি চিঠিখানিকে সযত্নে পকেটে রেখে ড্রাইভারকে বল্লেন, "বাড়ী চল।"

দেখতে-দেখতে তাঁর গাড়ি গেটের মধ্যে প্রবেশ করলো। মোটর থেকে নেমে অতি সন্তর্পণে চিঠিখানা নিয়ে তিনি

বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন। তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, চিঠিখানি খুলে তিনি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্লেন।

চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রিয় হরিহরবাবু,—

ভেবেছেন ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে বেঁচে যাবেন ? তা' আর আমরা হ'তে দেব না। কারণ, ঐ গুপ্তধন আমাদের চাইই। আমরা যে আপনাকে অনুসরণ ক'রে চলেছি, তা' আপনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন। গুপ্তধনের ডায়েরি আমরা পেয়েছি, কিন্তু তার ম্যাপ আমরা পাই নি। তাই বলছি যে, সেই ম্যাপ আপনাকে দিতেই হ'বে—আজ রাত্রি বারোটার সময়। অন্যথা করলে আপনার মৃত্যু। আমরা যা' ব'লে থাকি, কাজও তা' করি, এটুকু মনে রাখবেন।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী

আইনুদ্দিন খাঁ।

চিঠিখানি পড়ে তিনি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন ; তাঁর মনে হলো, "অন্যথা করলে মৃত্যু। যদি অন্যথা করি, তাহলে নিশ্চয়ই মৃত্যু। কিন্তু কি করেই বা পরের হাতে এত বড় সম্পত্তি তুলে দিই ? এ যে অসম্ভব—এ আমি করতে পারব না—এ প্রাণ থাকতে নয়।"

সহসা পুত্র অজয় এসে পিতাকে জিজ্ঞেস করলো, "বাবা, ওটা কার চিঠি ?"

—"কে? ও অজয়! ও কিছু নয় রে বাবা! তুই বরং একটা কাজ কর, এক কাপ চা আনতে বল্‌তো!"

—"আচ্ছা বলছি।"

হরিহরবাবু ভাবতে লাগলেন: "আমি যদি খুন হই, তাহলে এই পুত্রের কি হবে? কিন্তু আমি মরে গেলেও, এই গুপ্তধন যাতে ছেলেই পায়, তার ব্যবস্থা আমি করবই।"

—"আচ্ছা বাবা! আপনি এরকম মন-মরা হ'য়ে আছেন কেন? আপনি তো এরকম ছিলেন না! সব সময়ই কি নিয়ে যেন মাথা ঘামাচ্ছেন!"

—"সময় হলে বলব অজয়, আপাততঃ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিস নি।"

হরিহরবাবু মনে-মনে ভাবতে লাগলেন: "আজ রাত্রি বারটা। চিঠি দিয়ে শাসিয়েছে—ম্যাপ না দিলে মৃত্যু। আচ্ছা দেখা যাক্, কেমন তুমি আইনুদ্দিন খাঁ! সমস্ত ঘরে আমি ইলেক্‌ট্রিক্ তার লাগিয়ে রাখব—যাতে কেউ আমার ঘরে কোন জায়গায় হাত দিলেই কলিং বেল্‌টা বেজে ওঠে! আর অজয় ত' পাশের ঘরেই শোয়—তেমন কিছু হলে তখনই বেরুতে পারবে। তারপর ড্রাইভার আর চাকরকেও ওপরে শুতে বলব। শাসিয়েছে,—অন্যথা করলেই মৃত্যু! ওরে শয়তান, মনে করেছিস ভয় দেখিয়ে সমস্ত আদায় করে নিবি? সে রকম লোক আমি নই রে, আমি নই!"

সামনের লোকটিকে যেই গুলি করা, অমনি পেছন থেকে...

[পৃঃ—১০

রাত্রি প্রায় নয়টা।

হরিহরবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে! তাঁর কথামত ড্রাইভার ও চাকর ওপরে তাদের শোবার জায়গা করে নিয়েছে। পাশের ঘরে ত অজয় আছেই! তবে আর ভয় কি?

ক্রমে এগারোটা বাজলো—হরিহরবাবুর চোখে ঘুম নেই। তিনি কেবলই ভাবছেন, কখন তাঁরা আসে! একবার পাশে দেখে নিলেন বন্দুকটা ঠিক আছে কি না?—হ্যাঁ, ঠিকই আছে।

সাড়ে এগারোটা হলো। আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। হরিহরবাবুর সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই আবার তিনি ভাবেন, কলিং বেলের আওয়াজ ত হবেই! আর সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বন্দুক ছুঁড়বেন। ভয় কি?

দেখতে-দেখতে নীচের ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল। তিনি ভাবলেন, চিঠিতে ত এই সময়ই লেখা ছিল!

তিনি কলিং বেলের আওয়াজের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছেন, এমন সময় সহসা অন্ধকারের বুক চিরে তীব্র টর্চের আলো এসে তাঁর মুখের ওপর পড়ল।

হরিহরবাবু সেই আলোয় দেখতে পেলেন, একজন লোক আপাদ-মস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে একটি রিভলভারের মুখ তার দিকে ঘুরিয়ে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হচ্ছে আর বলছে, "মনে করেছিলেন, সমস্ত ঘরে কলিং বেলের তার ফিট্ করে আমাদের বাধা দেবেন! কিন্তু দেখছেন, আমরা

আপনার ঘরেই দাঁড়িয়ে আছি অথচ বেলের কোন শব্দ হলো না! শুনুন তবে কেমন করে আমরা আপনার ঘরে প্রবেশ করেছি।

আপনি সাড়ে আটটায় যখন খেতে গিছলেন তখন দরজায় কোন তালা ছিল না। তাতে আমাদের সুবিধাই হয়ে গেল। আমরা ঘরে ঢুকে আপনার দেরাজের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে রইলুম। তারপর তো দেখতেই পারছেন—আমরা আপনার সামনে!"

হরিহরবাবু অপমানে ও লজ্জায় পাগল হয়ে উঠলেন! তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "তোমরা যার আশায় এসেছ, তা' আমি দেব না। তার পরিবর্ত্তে এই নিয়ে যাও," বলে সামনের লোকটিকে যেই গুলি করা, অমনি পেছন থেকে উপর্য্যুপরি দুই গুলিতে তাঁর মাথার পেছনের খানিকটা অংশ উড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এদিকে রিভলভারের আওয়াজে সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

তিন

হরিহরবাবু জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলেন, তিনি অজয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। তাই দেখে এমন মৃত্যুর সময়েও তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

অজয় কোন কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই তিনি বললেন, "অজয়, নিশ্চয়ই তোমার জানতে ইচ্ছা করছে কেন আমার এ দশা হলো ? এবং কেই বা আমার এ দশা করলো ? আচ্ছা সবই বলছি, এখন আগে এক গ্লাস জল দাও।"

অজয়ের দেওয়া জল তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করে বললেন, "আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচবো না অজয় ! তবে যতক্ষণ বাঁচি, তার মধ্যে যা পারি বলে যাই। আগে শোনো কারা আমার এ দশা করেছে ! যারা করেছে, তাদের মধ্যে একজন—ঐ দেখো—দেরাজের ধারে পড়ে আছে, এবং আমারই গুলিতে সে মরেছে। বোধহয় গুলিটা ওর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেছে। যাক্, এখন কেন আমার এ দশা হলো, শোনো। কালকে ওদেরই দলের নায়ক 'আইনুদ্দিন খাঁ' আমাকে এক চিঠি দিয়ে শাসায়। তার কথা আমি তোমাদের না জানিয়ে মূর্খতাই করেছি। এই নাও সেই চিঠি।"

অজয় তা পাঠ করে বললো, "এ বিষয়ে ত আমাদের কিছুই জানাননি ! আর এর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ ?"

—"হ্যাঁ, আগে তা জানাইনি বটে কিন্তু এখন তা জানাতে বাধ্য হলাম, শোনো।—

এখন হতে প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে, তখন সবে আমি বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেছি, এমনি সময় বাবা বলে বসলেন, 'একটা চাকরী-টাকরী এবার কর্, আমি আর কতদিন চালাব ?'

আমিও চারদিকে চাকরীর সন্ধান করতে লাগলাম। কিছুদিনের মধ্যে আমার চেষ্টায় ও বাবার প্রভাবে পুলিশ-অফিসে একটি চাকরী পেলাম। তার পর ক্রমে-ক্রমে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ পেয়ে গেলাম। এরপর এখানে প্রায় তিন বৎসর রেখে আমাকে বদ্‌লি করে দিল ঢাকা টাউনে।

তখনও তুমি আসোনি। আমিও তখন আমার কর্ত্তব্য সাধন করে যাচ্ছি। সরকারী কাজে কয়েকটি আসামী গ্রেপ্তার করায় আমার বন্ধু যেমন বাড়তে লাগলো, শত্রুও যে সেই পরিমাণে কমতে লাগলো, তা নয় ; তবুও বন্ধু-মহলেই আমার প্রতিপত্তি হলো খুব বেশী।

কিছুকাল পরে ঢাকা সহরে তুমি জন্মগ্রহণ করলে ; কিন্তু তোমার জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই তোমার মা তোমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখে তোমাকে তোমার একমাত্র মামা নির্ম্মলবাবুর কাছে রেখে এলাম।

তোমার মামী ছিলেন নিঃসন্তান, তাই তাঁরা তোমাকে তাঁদের ছেলের মতই মানুষ করে তুললেন। আজ তাঁরাও তোমাকে ছেড়ে অন্য জগতে চলে গেছেন। শুধু আমিই ছিলাম

এতদিন, কিন্তু এখন তাও তোমার রইলো না। যাক্‌গে, এখন দরকারী কথা শোনো।

তুমি তো জান, আমার শিকারে কি রকম ঝোঁক! শিকার করা আমার যেন খাওয়া-দাওয়ার মত নেশা! একদিন সকালে শিকারে যাবার আয়োজন করে রহিমকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম।

চারদিকে ইতস্ততঃ ঘুরে-ঘুরে সবে মাত্র কয়েকটি ঘুঘু শিকার করেছি এমন সময় একটা কাতর আর্ত্তনাদ আমার কানে প্রবেশ করলো। আমি তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ লক্ষ্য করে গিয়ে দেখি, একজন অসহায় লোকের ওপর চার-পাঁচ জন লোক ঝুঁকে পড়েছে, আর তাদের মধ্যে একজন তার গলা টেপবার চেষ্টা করছে। তাই দেখে আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, সঙ্গে-সঙ্গে আমার পিস্তল হতে গুলি ছুটে গিয়ে তাদের এক-জনকে আহত করলো। তারা তৎক্ষণাৎ আহত ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি লোকটির কাছে গিয়ে দেখলাম, সে লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, কিন্তু খুব শীর্ণ। বস্ত্র জীর্ণ ও মলিন। সর্ব্বোপরি তার মুখে এক অজানা আতঙ্কের ছাপ! সে তখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তার জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমাকে কাছে দেখে তার মুখে আনন্দের রেখা ফুটে

উঠলো। সে বললে, 'আমি নিশ্চয়ই আর বেশীক্ষণ বাঁচবো না। আমাকে ওরা গুলি করায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হতেই দেখলাম, ওরাই আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, আর বলছে, 'গুপ্তধনের সন্ধান দেবে ত দাও, নইলে এখনি গলা টিপে শেষ করে দেব।' ঠিক সেই সময় বোধ হয় আমার চীৎকার আপনার কানে যায়, আর আপনি এসে আমার প্রাণ রক্ষা করেন।

আমি আপনাকে সে জন্য একটি পুরস্কার দেব; কিন্তু খুব সাবধান, কেউ যেন এর কিছু না জান্‌তে পারে! এই নিন্ সেই জিনিষ, যার জন্য ওরা আমাকে গুলি করে মারতে উদ্যত হয়েছিল।

এই যে দেখছেন একটি কবচ, এর ভেতর আছে গুপ্তধনের পথ-ঘাটের নক্সা। আর এই ডায়েরি-বইয়ের মাঝে এই গুপ্তধনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আছে। উঃ, আর কথা বলতে পারছি না। একটু জল দিন।'

আমি আমার ফ্লাস্ক হতে একটু জল বার করে তার মুখে ঢেলে দিলাম।

সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি এই গুপ্তধনের বিষয় কোথা হতে জানলাম শুনুন।

আমি প্রথম জীবনে ঢাকার অন্তর্গত টঙ্গি নামক জায়গায় এক বিখ্যাত জমিদারের অধীনে কেরাণীর কাজ করতাম। এই গুপ্তধনের সন্ধান তাঁরা নাকি উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়ে আসছেন।

তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলে মৃত্যুর সময় আমাকে এটি দান করে যান। কিন্তু আমি তো আর গুপ্তধন উদ্ধার করে ভোগ করতে পারলাম না, এখন আপনি দেখুন,...' এই বলে সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। তার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেল।

সে ইসারায় আমাকে জানিয়ে দিল—'খুব সাবধান!' পরক্ষণেই তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। আমিও এই সব দেখে-শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

কোন রকমে বাড়ী ফিরে এসে জিনিষ দু'টিকে কোন এক গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখে সর্ব্বপ্রথমে রহিমকে বললাম, 'এক গ্লাস জল দাও!'

জল খেয়ে যখন সুস্থ বোধ করলাম তখন আমার মনে হলো, আমি যেন কোন্ এক সোনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি! খানিকক্ষণ ইজি-চেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করে সমস্ত ঘর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে আমি দরজাটি বন্ধ করে দিলাম। তার পর সেই জিনিষ দু'টি বার করে খুব মনোযোগের সহিত দেখতে লাগলাম।

নক্সাটি দেখে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাই সেটাকে কবচের মতো হাতে পরে রইলাম। দূর থেকে চেনে কার সাধ্য! দেখলে সকলেই মনে করবে, আমি সাধারণ কোন কবচই পরে আছি! কারো মনে একটুও সন্দেহ হবে না।

তারপর ডায়েরির পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে এক জায়গায়

'আমার চোখ পড়লো। সেখানে লেখা ছিল—'আমরা পুরুষানুক্রমে যে গুপ্তধনটি পেয়ে আসছি, সেটি এবার অন্য লোকের হাতে পড়বে। কেন না, আমি নিঃসন্তান। আমার প্রপিতামহও ছিলেন ঢাকার টঙ্গি নামক স্থানের বিখ্যাত জমিদার। তাঁর অগাধ ধনরত্ন ছিল। কিন্তু তাঁর পুত্র অর্থাৎ আমার পিতামহ ছিলেন ভয়ঙ্কর দুশ্চরিত্র। সর্ব্বদা নানারকম নেশা ও নানা অসৎ কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাই তাঁর পুত্রকে সম্পত্তি দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার পিতামহ প্রপিতামহের জীবিতাবস্থায় মারা যান। তাই সেই সম্পত্তি বাবা উত্তরাধিকারী-সূত্রে লাভ করেন। তারপর বাবার মৃত্যুর পর তা আমার হস্তগত হয়। কিন্তু আমি যখন সেই জিনিষ পেলাম তখন আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাই আর আমার ভাগ্যে সেই সম্পত্তি ভোগ করা সম্ভব হলো না। যাহোক, আমার জমিদারীর এক বিশ্বস্ত কেরাণীকে আমি এই সম্পত্তি দান করব ঠিক করেছি।

আমার বাড়ী থেকে প্রায় একশ' ফুট দূরে একটি ছোট জঙ্গল আছে। সেই জঙ্গলটি অতিক্রম করে খানিকটা জলাভূমি পার হয়ে একটি ছোট পুষ্করিণী। তারপর—' "

সহসা হরিহরবাবুর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো। তিনি বল্লেন, "ওঃ আর আমি বলতে পারছি না। আমার সামনে সমস্ত জগৎ যেন আঁধার হয়ে আসছে! অজয়, আর একটু কাছে এসে বসো বাবা!"

—"বাবা, ডাক্তার…"

—"না না, আর ডাক্তারের দরকার নেই অজয়! সবই বৃথা হবে। ওঃ, আর পারছি না বাবা! আমার এত শীগগির মরবার ইচ্ছে ছিল না রে! আমি আমার নিজের দোষেই মরণ বরণ করলাম। এখন তোর যে কি হবে…"

—"বাবা, আমি যেমন করে পারি, এর প্রতিশোধ নেব। তাতে যদি আমারও জীবন যায়, কুণ্ঠিত হব না।"

—"যাক্, তোর এ আশ্বাসবাণী শুনে তবুও শান্তিতে মরতে পারবো।

তোকে বলতে ভুলে গেছি সেই ডায়েরীটা ঢাকায় থাকতেই ওই মুসলমানের দল এক রাত্রে হানা দিয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু সেই কবচটি নিয়ে যেতে পারেনি। আর সেই কবচের জন্যেই তাদের কাজ আটকে যাচ্ছে। এই যে সেই কবচটি।" এই বলে তিনি তাঁর ডানহাতের মণিবন্ধের দিকে তাকালেন; কিন্তু তখন আর খুলে দেবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

—"আর একটি কথা, কবচটিকে আমার মতন…"

আর তিনি কথা বলতে পারলেন না, তাঁর সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল।

অজয় এক-বিন্দু অশ্রুপাতও করলো না। তখন তার সমস্ত শরীর প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সে ধীরে-ধীরে মৃত পিতার হাত থেকে অতি সাবধানে কবচটি খুলে নিলো। তারপর তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে নিজের মাথায় ও বুকে মাখিয়ে দিল।

চার

বিখ্যাত সখের গোয়েন্দা রঞ্জিত রায় দৈনিক কাগজ নিয়ে প্রাতরাশ শেষ করতে ব্যস্ত; তার 'স্পেনিয়াল ডগ' লুব্ধ দৃষ্টিতে টেবিলের ওপর রক্ষিত বিস্কুটের দিকে চেয়ে আছে, আর মাঝে-মাঝে তার উদ্দেশ্য কি, তা বার-বার করে জানিয়ে দিচ্ছে ও লেজটি দিয়ে রঞ্জিতের পায়ে আঘাত করছে।

রঞ্জিতের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে সেদিনকার খবরের কাগজে এমন রস পেয়েছিলো যে, একেবারে নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলো।

এমন সময় চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করে টেলিফোনটা ক্রিং-ক্রিং করে সশব্দে বেজে উঠলো।

রঞ্জিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিসিভার হাতে নিয়ে বল্ল, "হ্যালো! কে?"

তারের ওধার হতে জবাব এলো, "আমি হচ্ছি অজয়, এবং চাই গোয়েন্দা রঞ্জিতবাবুকে।"

—"আরে অজয় নাকি! আমিই তোর রঞ্জিতবাবু! তা কি খবর?"

এখানে বলে রাখা দরকার অজয় ও রঞ্জিত এক কলেজ

হতে পাশ করে বেরিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বিদ্যমান। আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পরে তাদের মধ্যে টেলিফোন-যোগে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

অজয় বলল, "আর বলিস্ কেন ভাই, বড্ড দুঃসংবাদ! কাল রাতে বাবাকে কারা খুন করে গেছে!"

—"বাবা মানে! হরিহরবাবু! এ যে বড় তাজ্জব ব্যাপার দেখছি! তা মৃতদেহ ঘরেই আছে ত?"

—"হ্যাঁ, আছে। তুই না এলে চলছে না।"

—"তা আমি যাচ্ছি। পুলিশে খবর দিয়েছিস নাকি?"

—"দিয়েছি। আর একটা কথা এই যে আততায়ীদের মধ্যে একজন বাবার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।"

—"লোকটাকে দেখে কি রকম মনে হয়?"

—"মুখের কাপড় খুলে একবার দেখেছিলাম। দেখে মনে হয় পূব-দেশী মুসলমান।"

—"আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি।"

টেলিফোনের রিসিভার সবে নামিয়েছে, এমনি সময় রঞ্জিতের সহকারী অমল ঘোষ সহাস্য-বদনে ঘরে প্রবেশ করে বললো, "কি রে! এমন প্যাঁচার মত বসে কেন?"

রঞ্জিত সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে বল্লে, "আমাদের সেই কলেজের বন্ধু অজয়কে মনে পড়ে তোর?"

—"ও! অজয় সরকার? অনেকদিন তো তার সঙ্গে দেখা হয়নি!"

—“কাল রাতে তার বাবা আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছেন।”

—“বটে! তুই যাচ্ছিস নাকি?”

—“হাঁ। অজয় যাবার জন্যই টেলিফোনে অনুরোধ করেছে। যাবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি। তা তুই যাবি তো?”

—“আমি তোরই সহকারী তো! তুই যেখানে যাবি, আমারও গতি সেই দিকে। কিন্তু এখনি তৈরী হতে হবে তো?”

—“হ্যাঁ, তৈরী হয়ে নে—আমরা আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরুব।”

—“আচ্ছা, আমি বাড়ী যাচ্ছি। এখনি তৈরী হয়ে আসছি।”

রঞ্জিতও তার চিন্তাকুল দেহখানিকে সামনের সোফাতে এলিয়ে দিল।

তার মন যেন রহস্যের কোন্ হদিস খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে একরকম লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠে পড়লো।

—“পেয়েছি! পেয়েছি!! মনে পড়েছে—অজয় একবার যেন বলেছিল যে, তার বাবা ঢাকায় আজ প্রায় কুড়ি বৎসর আছেন। তাহলে তো আর বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না! আবার তার ওপর আততায়ীর একজন যে নিহত হয়েছে তাকে নাকি দেখতে পূব-দেশীয় মুসলমানের মত। তাহলে অজয়ের বাবা নিশ্চয়ই ঢাকার কোন রহস্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং তাঁর মৃত্যু নিশ্চয়ই সেই রহস্যের বলি-স্বরূপ।”

সহসা কে যেন তাঁকে চিন্তা-সাগর থেকে তুলে আনলো।

রঞ্জিত সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আরে! এর মধ্যে চলে এলি!"

—"এর মধ্যে? আধ ঘণ্টা পুরু হতে আর তো মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে! তোর কথার যে কোন ঠিক নেই!"

—"ক্ষমা করিস্ ভাই!" বলে রঞ্জিত তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে প্রবেশ করলো।

পাঁচ

রঞ্জিতের গাড়ি সবেমাত্র তার বালিগঞ্জের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের দিকে উল্কার বেগে ছুটতে সুরু করেছে, এমনি সময়ে তার মনে হলো, একটি আপাদ-মস্তক কালো রংয়ের ঢাকা গাড়ি যেন তারই বাড়ীর কাছে এসে ধীরে-ধীরে গতিবেগ মন্দীভূত করে নিচ্ছে!

রঞ্জিত এক মুহূর্ত্ত দেখে নিয়েই ড্রাইভারকে বল্লে, "সামনে ঐ মোড়ের বাঁকে আমাদের গাড়িখানাকে লুকিয়ে রাখো। অমল, তোকে নিয়ে আমি পায়ে হেঁটে ঐ গাড়িটার অনুসরণ করবো। দেখি, ও কোথায় যায়!"

মুহূর্ত্ত পরেই রঞ্জিত বললে, "ঐ ছাখ্, অমল! আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হলো। আমার বাড়ীর সামনেই গাড়ি থেমেছে। কে যেন বেরিয়ে ঐ ছাখ্ আমারই বাড়ীতে ঢুকছে! মদন তো আমারই চাকর। তাকে তো আর বলতে হবে না! সে ঠিকই অভ্যর্থনা করবে।"

আরে, ঐ ছাখ্, লোকটি বেরিয়ে এসে গাড়ি ছেড়ে দিল! চল্, এবার গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি!"

বাড়ীতে পা দিতে না-দিতে মদন এসে বলল, "বাবু, একজন লোক এই মাত্র এসেছিল।"

—"সে কি বললে ?"

—"বললে, 'তোর বাবু কোথায় ?'

আমি বললাম, 'তিনি এইমাত্র একটা কাজে বেরিয়েছেন।'

সে বললো, 'আচ্ছা, এই নে দশটা টাকা। বলতে পারিস তোর বাবু ঐ হরিহর সরকারের তদন্ত হাতে নিয়েছেন কি না ?'

—'আমি বল্লাম, 'তা তো বাবু বলতে পারছি না। তবে এই মাত্র তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আপনার নামটা শুনতে পারি কি ?'

সে বললে, 'তার নাম রামরতন তালুকদার।'

রঞ্জিত কহিল, "তাকে কি রকম দেখতে রে ?"

—"কাকে ? সেই অচেনা বাবুটিকে ?"

—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ।"

—"বেশ খানিকটা লম্বা। পরণে কালো ধূসর রংয়ের স্যুট। মাথায় বাবরি চুল। ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। চোখে রিম্‌লেস চশমা। কথা বলে একটু ধীরে-ধীরে।"

—"তুই যে তার নাড়ী-নক্ষত্র সব দেখে রেখেছিস !"

—"বাবু, আর একটি কথা। আপনাকে সে একটি খামে মোড়া চিঠি দিয়ে গেছে।"

—"কই দেখি !"

রঞ্জিত চিঠিটার আগাগোড়া পড়ে বললে, "বাঃ! বাঃ! তদন্ত সুরু। অমল, পড়ে ছাখ্, চিঠিতে কি লেখা আছে !"

রঞ্জিতবাবু,—

মনে করবেন না আমি আপনার অচেনা। আমি আপনার খুবই চেনা, অথচ অচেনা। যাক্, সে কথার দরকার নেই। এ সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, বুঝলেন? হরিহরবাবু তাঁর নিজের দোষেই মরেছেন। আমি বেশী আর কিছু বলতে চাই না। সাবধান!

আইনুদ্দিন খাঁ

—"কিরে অমল! কিছু বুঝলি?"

—"তদন্ত আরম্ভ হবার আগেই শত্রুরা জানিয়ে দিলে যে আমরা হরিহরবাবুকে খুন করেছি।"

—"ঠিক তাই। আয় এখন, অজয়কে এর বিষয় কিছু জানিয়ে দিই।"

টেলিফোনের রিসিভার তুলে রঞ্জিত বলল, "ক্যালকাটা ২১২১।"

তারের ওধার থেকে কেউ বলে উঠলো, "হ্যালো! কে?"

—"আমি রঞ্জিত। নির্দ্ধারিত সময়ে যেতে পারিনি বলে কিছু মনে করিস নি, পথেই তদন্ত সুরু হয়ে গেছে।"

—"বলিস কি?"

—"হ্যাঁ, গিয়ে সব বলবো।"

রঞ্জিত টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

ছয়

দেখতে-দেখতে রঞ্জিতের গাড়ি হরিহরবাবুর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

রঞ্জিত গাড়ি থেকে নেমে বললে, "অমল! দেখছিস্ হরিহরবাবু কি রকম সৌখীন লোক ছিলেন!"

—"তা তো তাঁর এই সুন্দর বাগানই সাক্ষ্য দিচ্ছে!"

—"থাক্, ও-কথা রাখ্। এখন যা করতে এসেছি তাই করা যাক্।"

রহিমকে যেতে দেখে অমল বলে উঠলো, "ওহে! অজয়-বাবুকে একবার ডেকে দিতে পারো?"

—"কেন পারবো না! আপনাদের নামই তো রঞ্জিত-বাবু আর অমলবাবু?"

—"হ্যাঁ। অজয় কোথায়?"

—"আসুন, আসুন! বসুন! তিনি একটু থানায় গেছেন। বলে গেছেন 'যদি রঞ্জিতবাবুরা আসেন তো তাঁদের বসিয়ে বলবি তিনি এখনি আসছেন।' আপনারা বসুন। আমি চা-এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

খানিকক্ষণ পরে যথারীতি চা-বিস্কুট পান করে রঞ্জিতরা সবে গল্পের গোড়াপত্তন করেছে, এমন সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল!

একজন লোক বাড়ী ঢুকতে গিয়ে রঞ্জিতকে দেখে থতমত খেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অমল এর কিছুই বুঝল না; কিন্তু বুদ্ধিমান্ রঞ্জিতের চোখে সবই ধরা পড়ে গেল।

অমল অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, "রঞ্জিত! লোকটা বাড়ীতে ঢুকলোই বা কেন, আবার অমন ভাবে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলই বা কেন?"

—"আমাকে দেখতে পেয়েছে বলে!"

—"তোমাকে দেখতে পেয়েছে বলে? কি সব হেঁয়ালি করছো! জান তো বল।"

—"ওর চেহারা দেখে মদনের বর্ণনা মনে পড়ছে না?"

—"ওঃ! হ্যাঁ, তাই ত! এও তো সেই ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি! রিম্‌লেস চশমা! শুধু স্যুট্‌টাই পালটেছে! এখন হলদে রংয়ের স্যুট্। তাহলে তুই কি বলতে চাস্ যে ওই আইনুদ্দিন খাঁ?"

—"যদি বলি তাই!"

—"কিন্তু ও এখানে এসেছে কেন?"

—"আমরা এসেছি কি না দেখতে বোধ হয়।"

—"তা হলে তো ওর আশা পূর্ণ হয়ে গেল।"

—"এবার তাহলে সাবধান! কোন্‌দিন বা পরলোকের পথ দেখিয়ে দেয়!"

—"তোর মুখে এরকম কথা মোটেই শোভা পায় না।"

—"তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলাম। ও-সব কথা এখন থাক্। ঐ বোধ হয় অজয় আসছে আর তার সাথে আছেন দারোগা-সাহেব।

অজয় তাদের দেখেই বলে উঠ্‌লো, "এই যে তোরা মাণিক-যোড়ই এসেছিস দেখছি! আমি থানায় দারোগা-বাবুকে ডেকে আনতে গিছলাম। এখন তবে সবাই চল্ যে-ঘরে বাবার মৃতদেহ আছে।"

রঞ্জিত বললে, "তুই কি ভদ্রতা জানিস না? আমাদের মধ্যে আলাপ হলো না, আগেই কাজ?"

—"ওঃ! একেবারে ভুলেই গিছলাম ভাই! বাবার মৃত্যুতে আমার মনের অবস্থা বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছে। আর এই দ্যাখ্ ভাই, ইনি হচ্ছেন দারোগা-সাহেব—ওঁর নাম শ্রীঅমরনাথ বিশ্বাস। আর দারোগাবাবু, আমার বন্ধুদের নাম..."

—"ওটা আর বলতে হবে না। কারণ ওঁদের নাম জানে না এমন লোক কলকাতা সহরে নেই! কি বলেন রঞ্জিতবাবু?"

সকলের মুখ দিয়েই হাসির ফোয়ারা বেরিয়ে এলো।

সকলে ভাবতে-ভাবতে মৃতদেহ যে ঘরে আছে, সেই ঘরে ঢুকলে; অজয় প্রথমে হরিহরবাবু যেখানে আছেন সেখানে নিয়ে গেল।

দামী চাদরে বিছানা মোড়া। কিন্তু তা রক্তে একেবারে

রাঙ্গা হয়ে গেছে! একটা গুলি হরিহরবাবুর পিঠে ও একটা গুলি মাথা ঘেঁসে খানিকটা চামড়া-সমেত বেরিয়ে গেছে।

সেখান থেকে সকলে দেরাজের কাছে এলো, যেখানে আততায়ী নিহত হয়ে পড়েছিল।

লোকটিকে দেখলে মনে হয়, সে পূব-দেশী মুসলমান। বয়স তিনের কোঠায়, সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য পুরোনো ক্ষতের দাগ। লোকটা যে পুরোনো আসামী, তা এই দাগ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পরণে একটি চেক্ লুঙ্গি। মুখ তখনও কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল।

দারোগা অমরবাবু মুখ থেকে কালো কাপড়টা খুলতেই তাঁর মুখ যেন পাংশুবর্ণ হয়ে গেল!

অতি অস্ফুট কণ্ঠে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "এ কি সম্ভব? এ যে দস্যু মায়ারতন!"

—"কি বললেন? দস্যু মায়ারতন! কৈ দেখি?" বলে রঞ্জিত মৃত লোকটির মুখের দিকে চাইলো—"সত্যই তো! বেচারা দ্বীপান্তর থেকে পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পেল না?"

দারোগা অমরবাবু মায়ারতনের পকেট হাতড়ে দুটি কাগজ পেলেন।

রঞ্জিত সে দুটো একরকম ছোঁ মেরেই নিয়ে বললে, "এ দুটো আমার কাছেই থাক্।"

অমরবাবু এক প্রকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন।

পরক্ষণেই রঞ্জিত বলে উঠলো, "অমরবাবু, এবার তাহলে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে লাস মর্গে চালান করবার ব্যবস্থা করুন।"

—"আচ্ছা! অজয়বাবু, এখন একবার টেলিফোন যে ঘরে আছে সেখানে আমায় নিয়ে চলুন না?"

—"আসুন!" বলে অজয়, অমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেই দেখলো, কে যেন রিসিভার হাতে নিয়ে টেলিফোনে কথা কইছে!

লোকটার বেশভূষা নোংরা, কুলীশ্রেণীর লোক! সে অজয়ের অচেনা, কিন্তু দারোগা অমরবাবু তাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বল্লেন, "কি রে মাধো! তুই এখানে?"

মাধো নামধারী লোকটা ততক্ষণে পেছন ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরাধীর মতো মুখ তার, কিন্তু দৃঢ় ও সতেজ!

অজয় বললে, "আপনি চেনেন একে?"

অমরবাবু বললেন, "চিনি বই কি! কিন্তু আজ এই ঘণ্টাখানেক আগেই লোকটার সাথে পরিচয়। থানার কাছে পাইচারী করে বেড়াচ্ছিল সন্দেহজনক ভাবে। তাই দেখে আমি ধমকে বলেছিলুম, 'এখানে এভাবে ঘুরে বেড়ালে, তোকে জেলে পাঠিয়ে দেবো।' ও তখন বলে, 'তা হলে তো বেঁচে যাই কর্ত্তা! আজ তিন দিন না খেয়ে আছি।' লোকটার কথা শুনে দুঃখু হলো। তারপর ওকে একটা টাকা দিয়ে বিদায় করে দিই।"

অমরবাবু এই বলে হঠাৎ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন, “এ বাড়ীতে তুই ঢুকলি কি করে? সত্যি করে বল্।”

মাধো বল্লে, “পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকেছি।”

অমরবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন, “পাজি কোথাকার! ভদ্দরলোকের বাড়ী ঢুকেছিস পাঁচিল টপকে! তোকে এখনই অ্যারেষ্ট করবো জানিস?”

—“অ্যারেষ্ট কাকে করে একবার দেখাচ্ছি,” বলে সেই মাধো লোকটি মারলে অমরবাবুর থুতনিতে এক ঘুঁসো! সঙ্গে-সঙ্গে অমরবাবু টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন।

অজয় এ-সব অভাবনীয় ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়ে যেমন ঘুসি বাগিয়েছে, অমনি পেছন থেকে রিভলভারের এক কুঁদোতে ধরাশায়ী হলো। এদিকে সেই মাধো নামধারী লোকটিও তার দলবল নিয়ে সরে পড়লো।

প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল।

রঞ্জিত অমলকে বললে, “কি রে অমল! অজয় যে কর্পূরের মতো উবে গেল দেখছি! প্রায় পনের মিনিট হয়ে গেল এখনো আসছে না কেন? চল্ না, নীচে গিয়ে দেখি?”

নীচে গিয়ে তারা যা দেখলো তাতে তাদের মুখে কথা ফুটলো না। তারা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো!

অমরবাবুর ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে আসছিল। রঞ্জিত তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলো, "এ কি ব্যাপার? আপনাদের এ অবস্থা কে করলে?"

—"আর বলেন কেন মশাই! ঘরে ঢুকতেই দেখি, এক ব্যাটা ভিখিরী, আমি তাকে 'মাধো' নামে জানতুম, সে টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে কথা কইছে। তাকে যেই অ্যারেষ্ট করবো বলেছি, অমনি সে এক ঘুসিতে আমার এই অবস্থা করেছে!"

অমল বল্লে, "আচ্ছা, ও আবার ফোন করছিল কেন?"

—"সেটা আর বুঝতে পারছিস্ না? আমরা যে তদন্তের ভার নিয়েছি, সেই খবরটা অন্য কাউকে জানিয়ে দিচ্ছিলো। তা যাক্, এখন তবে বাড়ী যাই। ততক্ষণ তোরা লাস সরাবার ব্যবস্থা কর। অজয়! তোর নামে বোধ হয় চিঠি এসেছে!"

অজয় চিঠিটা খুলে কিছুই বুঝতে না পেরে তা রঞ্জিতের হাতে দিল। রঞ্জিত চিঠিখানি পড়ে অমলকে বললে, "পড়।"

অমল পড়লে,—

রঞ্জিতবাবু,

মায়ারতনকে চিনেছেন বলে এবং তদন্তের ভার নিয়েছেন বলে আমাদের কিছু এসে যাবে না। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করবই। ইতি—

'আইনুদ্দিন খাঁ'

সাত

রঞ্জিতদের গাড়ি ঘরমুখো ঘোড়ার ন্যায় ছুটে চলেছে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। সূর্য্যদেব যেন তাঁর তেজ সকলকে দেখিয়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করছেন!

এমন সময় রঞ্জিতের একটা কথা মনে পড়ায় সে অমলকে বললে, "তোর মনে আছে কি আততায়ীর পকেট হাতড়ে দুখানি কাগজ অমরবাবু আমার হাতে দিয়েছিলেন?"

—"হাঁ, তাতে কি হয়েছে?"

—"হয়েছে বৈকি কিছু! সে দুটিতে তখনই আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলাম এবং পড়ে দস্তুরমত অবাক হয়ে যাই।"

—"কেন? তাতে এমন কি ছিল যে তুই অবাক হয়ে গিয়েছিলি?"

—"তাতে কি আছে, ছাখ্", এই বলে সে কাগজ দু'খানি বের করলে। তার একটিতে লেখা ছিল,—

মায়ারতন,

তুমি ত পালিয়ে এসেছ, কিন্তু এখনও যে কোন সময় অ্যারেষ্ট হতে পারো। তা আমার সঙ্গে একটা কাজ করো না কেন? আমি এক রত্নের সন্ধান পেয়েছি। তাতে তোমার সাহায্য পেতে চাই। তুমি আমার

লোকটি মারলে অমরবাবুর থুতনিতে এক ঘুঁসো !

পৃঃ—৩০

সহকারী হিসাবে কাজ করবে, কেমন? আমার নাম এখন 'আইনুদ্দিন খাঁ', কাজেই আমার দোকানে এসে দারোয়ানের কাছে, আনু মিঞার খোঁজ করো। দারোয়ান আমারই বিশ্বাসী লোক। সে তোমায় দেখা করিয়ে দিবে।

সূর্য্যকান্ত সিংহ
জহুরী

আর একটা চিঠিতে লেখা ছিল,—

মায়ারতন,

প্রথমে আমাদের হরিহরবাবুকে সরাতে হবে। কারণ, তাঁর কাছেই আছে এই গুপ্তধনের পথঘাটের নক্সা। ডায়েরীটা আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের কাজ আটকে যাচ্ছে শুধু ঐ নক্সাটির জন্য। ওটাকে যে কোন প্রকারে হোক্, হস্তগত করতে হবে। কাল রাতে আমার বাড়ীতে এসো।

সূর্য্যকান্ত সিংহ
জহুরী

—"বুঝলি ত আইনুদ্দিন খাঁ লোকটি কে?"

—"তাই ত! এত বড় দোকানের মালিক—বিখ্যাত জহুরী! তার এই কীর্ত্তি? রহস্য যে ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে রঞ্জিত!"

—"রহস্য তো জটিল হবেই ভাই! এবং তাকে ভেদ করাই তো আমাদের কাজ।"

—"শেষ পর্য্যন্ত বিখ্যাত জহুরী সূর্য্যবাবুই আইনুদ্দিন খাঁ ?"

—"তাই তো চিঠিতে লেখা আছে।"

—"আচ্ছা, আমরা এখন এই চিঠি দু'টির জোরে ওর নামে ওয়ারেণ্ট বার করে ওকে তো অ্যারেষ্ট করতে পারি।"

—"তা তো পারি; কিন্তু তা করা চলবে না। এ রহস্য নিশ্চয়ই কোন গুপ্তধন-সংক্রান্ত।"

—"কি করে তুই বুঝলি ?"

—"নাঃ, তোকে নিয়ে আর কাজ করা চলবে না দেখছি! একটু আগে সূর্য্যবাবুর চিঠি পড়ে তবে তুই কি বুঝলি ? তুই কি শুধু নীচেকার নাম দুটোই দেখেছিস্ ?"

—"না, না, এবার বুঝতে পেরেছি। তাই হরিহরবাবুকে ওরা খুন করেছে, না! কি একটা গোপন নক্সা যেন হরিহরবাবুর কাছে আছে ?"

—"হ্যাঁ। সেইটা নিয়েই ত এত কাণ্ড!"

—"তা সেটা এখন কোথায় ?"

—"কি করে জানবো ? মনে হয় হরিহরবাবু মৃত্যুর সময় অজয়কে দিয়ে গেছেন।"

—"তা হলে বিকালে একবার চল্ না ?"

—"তাই ত অজয়কে বলে এসেছি।"

—"ঐ আমার বাড়ী এসে গেছে," বলে অমল গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বললে, "ঠিক সাড়ে চারটেয় তৈরী থাকিস। অন্যথা হয় না যেন!"

—"আগে তুই তো ঠিক সময়ে আয়, তারপর বলবি; বুঝলি ?"

রঞ্জিত আবার গাড়িতে ষ্টার্ট্ দিলে, গাড়ি পূর্ণ বিক্রমে এসে বাড়ীতে পৌঁছুল।

গাড়ি গ্যারেজে প্রবেশ করিয়ে মদনকে ডেকে রঞ্জিত বললে, "আমার আহারের ব্যবস্থা ঠিক আছে ত? আমি এখনি স্নান করে আসছি।"

—"যে আজ্ঞে।"

রঞ্জিত ভাবতে-ভাবতে বাথরুমে প্রবেশ করলো।

আট

হ্যারিসন্ রোড ও বৌবাজারের মোড়ে বিরাট পাঁচতলা প্রাসাদ। তারই নীচতলায় এক প্রসিদ্ধ জুয়েলার বা জহুরীর দোকান—এস্. কে. সিংহ এণ্ড কোম্পানী।

দোকানের মালিক সূর্য্যকান্ত সিংহ খুবই অমায়িক ও মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। উৎকৃষ্ট কারুশিল্পের জন্যও তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। অমল খদ্দের সেজে আজ তিন দিন যাবৎ তাঁর দোকানে মাঝে-মাঝে পদার্পণ করছিল। আর প্রতিবারই দু'-একটি ছোট জিনিষ—আংটি, দুল ইত্যাদি, একটা না একটা কিছু কিনে বেরিয়েছে।

সূর্য্যকান্ত সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য—মাত্র তিন দিনের। তবু যেন তার মন বলছিল, এরকম সুন্দর ও অমায়িক ভদ্রলোক কখনো হরিহরবাবুর খুনের মত নোংরা কাজে জড়িত থাকতে পারে না।

সেদিন বিকেলবেলা রঞ্জিতের সাথে দেখা করে, অমল শুধু সেই কথাই তাকে বলছিল। সে দৃঢ়ভাবে রঞ্জিতকে বল্লে, "তুই একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছিস্ রঞ্জিত! আমি হলফ করে বলতে পারি, সূর্য্যকান্ত জহুরী কখনো এমন কাজে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে না।"

ঈষৎ হেসে রঞ্জিত বল্লে, “সূর্য্যকান্ত সম্বন্ধে তোর যে এত উচ্চ-ধারণা, সেকথা আমাকে বলে কোন লাভই নেই বন্ধু! তুই যদি এই মহৎ কথাগুলো তোর ঐ সূর্য্যকান্ত বন্ধুটিকে জানিয়ে দিস, তাহলে হয়তো তার কৃপায় তোর একটু সুবিধা হয়ে যেতো! কিন্তু আমার কাছে তো আর হলফ কররার কোনো দরকার নেই অমল!”

অমল বল্লে, “সে কথা জানি রঞ্জিত! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুই কিছু ভুল করে যাচ্ছিস! কাজেই সূর্য্যকান্তের ওপর এত নজর রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।”

রঞ্জিত বল্ল, “তোর কথা হয়তো সবই সত্যি, অথবা কিছুই সত্যি নয়! কোন কিছু সঠিক ধারণা করবার আগে একটা জিনিষ মনে রাখিস অমল! কথাটা হচ্ছে এই যে, গোয়েন্দাগিরিতে এমন অনেক কাজ করতে হয়, যেগুলো শেষ পর্য্যন্ত অনেক সময় বৃথা বলেই মনে হয়েছে! আমার সব অনুমান বা সব পদ্ধতিই যে নির্ভুল, সেকথা আমি একেবারেই বলছিনে কিন্তু চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কেউ কি ঠিক করে বলতে পারে যে, তার কোন্ রাস্তায় যাওয়া সঙ্গত? এক-একটা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে দেখতে হবে, সেইটেই তার গন্তব্য রাস্তা কি না! তাতে দু’তিনবার হয়তো ভুল পথেই যেতে হবে, সেজন্য দুঃখু করলে চলবে কেন? এক্ষেত্রেও সেই জন্য বৃথা চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু তোকে যে-রকম বলে

দিয়েছিলাম, তুই সেই রকম করেছিস তো? না, অনাবশ্যক মনে করে কিছুই করিসনি?”

অমল বল্লে, “না, সে চিন্তা করিস না রঞ্জিত! তোর কথামত আমি সবই করেছি। আমার আরো তিনটি সহকারীকে সাথে নিয়ে আমি ঐ সূর্য্যকান্ত ও তার ফার্ম্মের ওপর খুব কড়া নজরই রেখেছি। সূর্য্যকান্ত যখন বাড়ী যায়, তখনো তাকে আমরা রেহাই দিই না। সে ঘুমোয়—না, সারারাত খেলা করে বা লেখাপড়া করে কাটায়, এ-সব খবরও আমি অতি সাবধানে সংগ্রহ করেছি। সে তার ফার্ম্ম ছেড়ে যেখানেই যাক্, কলকাতার সহরেই হোক্ বা কলকাতার বাইরে,—আমার লোক তাকে অনুসরণ করবেই। কাজেই তোর উপদেশ আমরা মেনে যাচ্ছি বর্ণে-বর্ণে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা হচ্ছে যে, লোকটা একেবারেই নির্দোষ।”

রঞ্জিত এক মুহূর্ত্ত কি একটু চিন্তা করলো। তারপর বলল, “সে যাই হোক্, কাজ করে যা অমল! কাজ বন্ধ রাখিস্ না। দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! মায়ারতনের চিঠিখানির কথা মনে রাখিস্—তাতে কোন এক সূর্য্যকান্ত জহুরীর নাম আছে। কাজেই এস্. কে. সিংহ কোম্পানীর মালিক সূর্য্যকান্ত জহুরী সেই চিঠির লেখক না হলেও, দুনিয়ার কোন-না-কোন সূর্য্যকান্ত জহুরী ঐ চিঠির জন্য নিশ্চয়ই দায়ী।”

এতক্ষণে অমলের চোখের সুমুখ থেকে যেন একটা অন্ধকার পর্দ্দা সরে গেল! সে হঠাৎ কিছু উত্তেজিত ভাবে বললে,

"বটে! তাহলে তুই বলতে চাস রঞ্জিত, এই সূর্য্য জহুরী এর সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও, অন্য কোন সূর্য্য জহুরী এর সাথে নিশ্চয়ই জড়িত রয়েছে। তবে, কে যে সেই লোক,—তাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। কেমন, এই না রঞ্জিত?"

রঞ্জিত হেসে বললে, "হাঁ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি তোর মাথা কিছু খুলেছে বটে! হরিহরবাবুর খুনের সাথে কোন সূর্য্য জহুরী জড়িত আছে, এতে আর কোন সন্দেহই নেই। সেই সূর্য্য জহুরী, এই বিখ্যাত সূর্য্য জহুরী না হতেও পারে, —আবার হতেও পারে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আর কোন সন্দেহভাজন সূর্য্য জহুরীর খোঁজ না পাচ্ছিস্, সে পর্য্যন্ত এই সূর্য্যকান্তকে হাল্কা ভাবে দেখলে ত চলবে না! এখন তা হলে বুঝতে পারছিস্ আমার কথা?"

—"হাঁ।" অমল তার মাথাটি ঈষৎ আন্দোলিত করে রঞ্জিতের কথায় সম্মতি দিলে। তারপর, "আচ্ছা, আসি এখন," বলে কিছু অন্যমনস্ক ভাবে অমল বেরিয়ে গেল।

রঞ্জিতও ইজি-চেয়ারখানিতে তার দেহটি এলিয়ে দিয়ে, উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে, কোন্ গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে, অবিরত সিগারেট টেনে যেতে লাগ্লো।

নয়

বিকেল পাঁচটা।

রঞ্জিতের গাড়ি এসে অজয়ের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে দরজায় পা দিতে না দিতেই রহিম এসে বললে, "আপনারা এসেছেন, ভালোই হয়েছে! বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল। ছোটবাবু তাকে বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছেন।"

—"তিনি কোথায় আছেন? আমাদের সেখানে নিয়ে চল।"

—"চলুন। আমি সেই জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আছেন বড় বাবুর ঘরে!"

রহিমের পিছু-পিছু রঞ্জিত ও অমল—যে ঘরে অজয় ছিল, সেই ঘরে এসে পৌঁছুল।

তাদের দু'জনকে আসতে দেখে অজয় বিছানা থেকে উঠে বসলো।

—"কি রকম বোধ করছিস এখন?"

—"এক রকম ভালো!"

—"কি হয়েছিল সব খুলে বল্‌তো?"

—"দাঁড়া, তার আগে তোদের চায়ের বন্দোবস্তটা করে দিই। রহিম, এঁদের জন্যে চা আনো!"

—"তোর কি খুব জোর লেগেছে ?"

—"না, না, মাথায় একটু চোট লেগেছে মাত্র। ব্যাপারটা কি হয়েছিল, বলছি শোন্।

দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমের আয়োজন করছিলাম কিন্তু ঘুম একদম আসছিল না। তাই বাধ্য হয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিলাম। এমন সময় বাবার ঘর থেকে দেরাজ খুলবার খুট্-খুট্ আওয়াজ শোনা গেল। আমি কৌতূহলী হয়ে দরজা খুলে দেখি, একজন লোক দেরাজের মধ্যে কি যেন খুঁজছে! সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের তলা থেকে পিস্তল নিয়ে গিয়ে বললাম, 'নড়েছ কি মরেছ!' সে ত থতমত খেয়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তার চোখ দুটো যেন তখনই বলছিল, সুযোগ! সুযোগ!!

আমি এগিয়ে গিয়ে দেরাজের ডালা বন্ধ করতে যাব, এমন সময় সে মারলে এক প্রচণ্ড ঘুসি। তারপর আমি এইখানে—তোমাদের সামনে!"

—"আচ্ছা। লোকটিকে দেখতে কি রকম ?"

—"একে এর আগে আর কখনো দেখিনি। লোকটা বেঁটে। মুখ গোঁফ-দাড়ি শূন্য!"

অমল এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে কি ভাবতে লাগল, তারপর বললে, "আচ্ছা অজয়! তুই কি জানিস যে তোর বাবা কোন গুপ্তধনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ?"

—"জানি বৈকি!"

—"তবে বলিস নি কেন ?"

—"বলতে সময় পেলুম কই ? আজই সে কথা বলবো ভাবছিলাম !"

এই বলে অজয় মৃত্যুর সময় পিতা যা যা বলেছিলেন, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলো।

—"তুই বলছিস্ যে ওরা ডায়েরীটা হস্তগত করেছে আর নক্সাটা এই ! তা ডায়েরীর বিশেষ দরকার হবে বলে মনে হয় না, নক্সারই হবে দরকার বেশী। ডায়েরীর যতটা জানা গেছে, ঐতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।"

—"কি বলছিস্ রঞ্জিত ! তুই সেখানে যাবি না কি ?"

রঞ্জিত বলে উঠলো, "নিশ্চয়ই। অমল, তুইও নিশ্চয়ই—"

—"তা আর বলতে ! কান টানলে কানের সাথে মাথা যাবেই !"

রঞ্জিত গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো. "সে তো পরের কথা। এখন এই নক্সার কি করছিস্ ?"

—"কি করবো, বল্ !"

—"ওরা নিশ্চয়ই রাত্রে আবার হানা দেবে। সে জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তো !"

—"তুই যা বিবেচনা করিস্ তাই হবে !"

—"আমার মতে এই নক্সাটিকে নকল করলে হয় না ? তাই দিয়েই ওদের ঠকাবো।"

—"বেশ। কর্ !"

—"অজয়! একটা পিতলের ছোট প্লেট দিতে পারিস্?"

—"কেন পারবো না! এই নে।" বলে সে ড্রয়ার খুঁজে একটি পিতলের চাকতি বার করে দিল।

—"সরু পিতলের বা ঐ জাতীয় চেন্ আছে কি?"

—"ঐটাই তো নেই! হ্যাঁ, বাড়ীর পাশে স্যাকরার দোকানে হয়তো পাওয়া যেতে পারে! আনিয়ে দেব?"

—"বেশ ভাল কথা। রহিমকে ডেকে বলে দে এই পিতলের চাকতিটির দু'পাশে চেনটি যেন ঝেলে আনে।"

অজয় রহিমকে ডেকে রঞ্জিতের কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে বললে, "এখনি করে আন্‌বি, বুঝলি?"

—"যে আজ্ঞে" বলে রহিম নিজের কাজে চলে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রঞ্জিত ঠিক যেমনটি চেয়েছিল, রহিম ঠিক তেমনটি করে নিয়ে এল।

রঞ্জিত মনের মতন জিনিষ পেয়ে বললে, "বাঃ! নিখুঁত হয়েছে! চমৎকার! এইবার আমাদের কাজ সুরু করা যাক্। অজয়, আর একটা জিনিষ দিতে হবে ভাই!"

—"কি?"

—"খোদাই করা যেতে পারে, এমন ধরণের খুব সরু কোন জিনিষ?"

—"আচ্ছা দিচ্ছি," বলে সে ড্রয়ার থেকে একটা মোটা ছুঁচ বের করে দিল।

—"হ্যাঁ, এইতেই কাজ হবে।" বলে রঞ্জিত নক্সাটি

নকল করতে বসে গেল। দেখতে-দেখতে প্রায় তিন কোয়ার্টারের মধ্যে আসল নক্সাটির অনুরূপ কিন্তু রেখাগুলো ঠিক একরকম নয়, এমন একটি নকল নক্সা প্রস্তুত হলো।

কাজ শেষ করে রঞ্জিত বললে, "সূর্য্যবাবুর সাধ্য কি এটা নকল বলে চেনে!" বলে সে অজয়কে বললে, "এই নক্সাটি দেরাজের মধ্যে চাবি বন্ধ করে রাখ্। আসল নক্সা আমার কাছে রইল। কাল সকালে উঠে দেখবি নকল নক্সা চুরি গেছে, আর আসল নক্সার আমি পাঠোদ্ধার করে বসে আছি! আচ্ছা, এখন তবে যাই।"

—"আচ্ছা আয় ভাই!"

—"আবার কাল সকালে খবর জানতে আসবো, বুঝলি?" বলে সে গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দিলে। গাড়িও খানিকটা ধোঁয়া বার করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চল্লো।

অজয় ভাবতে-ভাবতে বাড়ীতে ঢুকে রহিমকে ডেকে বললো, "রাত্রিতে খুব সাবধানে থাকবি, বুঝলি?"

—"কেন বাবু?"

—"তারা আসতে পারে।"

—"কারা?"

—"দুপুরে যারা এসেছিল।"

—"ও রে বাবা!"

—"ভয় খাসনি, যা বললুম মনে থাকে যেন!" বলে অজয় ওপরে উঠে গেল।

দশ

রাত্রি প্রায় দেড়টা। সমস্ত কল্‌কাতা সহর যেন অকাতরে ঘুমুচ্ছে! মাঝে-মাঝে গোটা-কতক পেঁচা রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙ্গে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করছিল।

গ্যাস্‌লাইট্‌গুলো পর্য্যন্ত যেন ঘুমের ঘোরে ঝিমুচ্ছে! এমন সময় হরিহরবাবুর বাড়ীর অদূরে একখানি মোটরের ঘর্‌-ঘর্‌ শব্দ শোনা গেল।

ক্রমে গাড়িটি এসে হরিহরবাবুর বাড়ীর পাশে এক জায়গায় এসে ব্রেক কষলো। সঙ্গে-সঙ্গে কালো-কাপড়ে আপাদ-মস্তক ঢাকা জন-কয়েক লোক অতি চুপি-চুপি পা টিপে-টিপে বাড়ীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ীটা সেইদিকে একতলা। একটি জানালার কিছু ঊর্দ্ধে আর একটি জানালা, তার পরেই ছাদের কার্ণিশ। সুতরাং আততায়ীদের সুবিধাই হয়ে গেল। তারা একের পর একে সেই জানালা দুটির সাহায্যে ছাদে উঠে গেল। তারপর সেখানে একটি হুকে দড়ি বেঁধে পরের পর নীচে উঠানে অবতরণ করলো।

তাদের সর্ব্বাগ্রে দলপতি, এবং তার পরে তিনজন লোক যথাসম্ভব নিজেদের লুকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বারান্দায় পৌঁছুলো।

হঠাৎ কিসে একটা হোঁচট খেয়ে তাদের মধ্যে একজন একেবারে 'পপাত ধরণীতলে!'

পড়বার আওয়াজ হওয়ায় সকলে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল; কিন্তু কোথাও কোন সন্দেহজনক কিছু না দেখে তারা আবার চলতে লাগলো এবং হরিহরবাবুর ঘরের সামনে এসে পৌঁছুলো।

ঘরের দরজা ঠেলে দেখলো দরজা ভেজানোই আছে।

তাদের সুবিধেই হলো। আস্তে-আস্তে ঘরে প্রবেশ করে দেখলো চারিদিক অন্ধকার।

হাতের টর্চ্চটা জ্বালতেই তাদের নজর পড়লো খাটের ওপর একজন লোক সেখানে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। সর্ব্বপ্রথমে তারা খাটের ওপর শায়িত লোকটিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো, তারপর সারা ঘর তচ্নচ্ করে খুঁজতে সুরু করলো।

এখানে-ওখানে খুঁজে হঠাৎ দেরাজ খুলেই দলপতি হতবাক্ হয়ে গেল! দেরাজের ভিতর ঝক্ঝক্ করছে সুন্দর একখানি পিতলের নক্সা!

সে নক্সাটিকে বাইরে আলোয় এনে দেখলো, তাতে হিজিবিজি কাটা আছে!

তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে, "দূর, এ কি! যার জন্য এতো চেষ্টা, সেটা এই জিনিষ? আমাদের এ জিনিষে কোন দরকার নেই, চল!"

—"কি হলো সর্দ্দার?"

—"কি আর হবে? নক্সা না ছাই! আমি ভেবেছিলাম,

বোধহয় কোন কিছু লেখা থাকবে নিশ্চয়ই! কিন্তু এ কি? এ যে কতকগুলি হিজিবিজি কাটা! কি হবে আমাদের এই সামান্য জিনিষ নিয়ে?"

বিরক্ত হয়ে সে জিনিষটা ফেলেই চলে যাবার উপক্রম করেছে, এমন সময় একজন বলে উঠলো, "এখান থেকে একেবারে শুধু হাতে ফিরতে হবে? তার চেয়ে আপনি ওটা সঙ্গে নিন্।"

—"আচ্ছা, তা নিচ্ছি!"

সবাই আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে, যেখান দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিল, সেই রাস্তা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

অমনি হরিহরবাবুর ঘরের ঘড়িটা রাত তিনটা ঘোষণা করলো।

দলপতি সশিষ্য মোটরে চড়ে ছেড়ে দিল। মোটরও চারদিকের স্তব্ধতা ভেদ করে পূর্ণবেগে এগিয়ে চললো।

ঠিক আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের মোড় পার হবে এমন সময় একটা পুলিশ চড়া গলায় বলে উঠলো, "এ মটোর ডেরাইভার! ঠাঁড়িয়ে তো! এতনা রাতমে কাঁহা যাতা?"

কিন্তু সেদিকে দৃক্পাত না করে গাড়ি মোড় পেরিয়ে পূর্ণ গতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এগারো

পরদিন সকালবেলা।

গতরাত্রে কি ঘটেছে তা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রঞ্জিত ও অমল একেবারে সোজাসুজি অজয়ের ঘরে প্রবেশ করলো।

অজয় তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। রঞ্জিতদের দেখতে পেয়ে বললে, "কি রে, এত সকালেই চলে এসেছিস ?"

—"সকাল মানে! সাড়ে আটটা বাজে যে রে! রাত্রে নিশ্চয়ই ঘুম হয়নি বোধ হয়!"

—"তা আর কি করে হবে ?"

—"রাতের ব্যাপারটা কখন বলবি ?"

—"দাঁড়া আগে, মুখ-হাত ধুয়ে নিই, তারপর চা খেতে-খেতে সব বলা যাবে।"

এই বলে অজয় বাথরুমে প্রবেশ করলো। রঞ্জিত ও অমল অজয়ের ঘরে দুইটি সোফায় গা এলিয়ে দিল।

তখন রৌদ্র উঠেছে। কিন্তু তা বেশ স্নিগ্ধ—বিশেষ তেজ নাই। সূর্য্যরশ্মি জানালার শার্সির ওপর পড়ে ঝলমল করছে। এমন সময় অজয় রহিমকে ডেকে চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করতে বলে ঘরে প্রবেশ করলো। তার মুখে একটা অস্বাভাবিক আনন্দের ছাপ!

"দূর, এ কি ! যার জন্ত এতো, সেটা এই জিনিষ ?"

[পৃঃ—৪৬

সে এগিয়ে এসে রঞ্জিতের পাশের সোফাটা দখল করে বললে, "তুই কাল যা বলেছিলি, তাই হয়েছে। নকল নক্সা চুরি গেছে।"

—"ব্যাপারটা ভাল করে খুলে বল্।"

—"আচ্ছা বলছি।"

রহিমও সময় বুঝে ট্রেতে করে চা-বিস্কুট এনে সামনের টেবিলে রাখলো।

অজয় কাপে চা ঢালতে-ঢালতে বললে, "কাল রাত্রে আমি একটা বাহাদুরী করেছি, শোন্।

কাল রাতে আমি আমার ঘরে না শুয়ে বাবার ঘরে শুয়েছিলাম, ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্য। খানিকক্ষণ জেগে থাকবার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ কার পড়ে যাওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন রাত ক'টা ঠিক বলতে পারি না। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই আইনুদ্দিনের দল হানা দিতে এসেছে। সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক হয়ে নিলুম এবং গায়ের চাদরটা মাথা পর্য্যন্ত ঢেকে দিলাম যাতে ওরা চিনতে না পারে।

দরজা ভেজিয়েই রেখে ছিলাম। তারপর আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো। প্রথমেই টর্চ্চের আলো বিছানার ওপর পড়লো এবং ঘরে একজন লোক আছে দেখে আমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। তারপর সমস্ত ঘর খুঁজে আশানুরূপ বে... ফল না পেয়ে অপ্রসন্ন মনেই চলে গেল।"

—"তার মানে?" রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করলো।

—"মানে, ওরা ভেবেছিলো ঐ নক্সাটায় কিছু পথ ঘাটের খবর লেখা থাকবে; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অমন হিজিবিজি কাটা দেখে, রাগে দিশেহারা হয়ে বেরিয়ে গেল।"

—"তবে জিনিষটা কই?"

—"নক্সাটা ত? সেটা আর একজনের অনুরোধে সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

—"তাহলে তুই বলতে চাস যে, নক্সাটা যে এরূপ হবে ওরা তা ভাবতে পারে নি। যাক্, আমার কাজও হাঁসিল হয়ে গেছে।"

—"কি কাজ?"

—"এর মধ্যে ভুলে গেলি কালকের কথা? আমি বলেছিলাম না কালকে দেখবি যে তোর নকল নক্সা চুরি গেছে আর আমি আসল নক্সাটির পাঠোদ্ধার করে বসে আছি!"

—"পাঠোদ্ধার হয়ে গেছে!" অজয় বিস্মিত হয়ে বললে।

—"নিশ্চয়ই?"

—"তবে বল্ না কি লেখা আছে!"

—"লেখা কিছুই নেই, কিছু আঁকা আছে।"

—"কি আঁকা আছে?"

—"বিশেষ কিছুই নয়। একটা মন্দির এবং মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের নীচে একটা গর্ত্ত।"

—"আর কিছু না?"

রঞ্জিত বললে, "না।"

অজয় বললে, "এবার তাহলে আমাদের যাত্রার আয়োজন করা যেতে পারে, কেমন ?"

—"তা হতে পারে।"

রঞ্জিত অত্যন্ত আনন্দের সহিত বললে, "কবে ঠিক করেছিস ?"

—"পরশু ত রবিবার, ঐ দিনই বেরিয়ে পড়া যাবে।"

—"আচ্ছা, আমি রাজি।"

বারো

শনিবার বিকেলবেলা।

সবে রৌদ্রের তেজ প্রশমিত হয়েছে। চারদিক গোধূলির অস্তমিত আভায় ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। নীড়ের পাখী চারদিক কলস্বরে মাতিয়ে যে যার নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। ছোট-ছোট ছেলেরা সারাদিন খেলার পর ক্লান্ত দেহে, ধূলিমাখা দেহে আপন ঘরমুখো।

খানিক পরে সন্ধ্যা নেমে আসে, ঘরে-ঘরে কুলবধূদের সন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। মন্দিরে-মন্দিরে আরতির বাজনা বেজে ওঠে। দেখতে-দেখতে কালো-কালো নারিকেল বৃক্ষের পেছন হতে চন্দ্রমার উদয় হয়। চারদিকে আধো-আলো আধো-ছায়া বিরাজ করছে।

রঞ্জিত বলে উঠলো, "অমল, এ বদ্ধ ঘর তোর ভালো লাগছে? আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না! চল্ না প্রকৃতির আপন হাতে গড়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করিগে। আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে!"

—"তাতে আর আমার আপত্তি কি। সে তো ভালই।"

—"হ্যাঁ, তাই তো আমাদের কবি বলেছেন,

'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে!' "

—"ও সব কবিরাই কল্পনায় উপভোগ করেন।"

কথা বলতে-বলতে রঞ্জিত ও অমল ছাদে উঠে দুইটি ইজি-চেয়ারে বসে পড়লো।

চাঁদ সেদিন জ্যোৎস্না দান করতে কৃপণতা করেনি। দূরে বনানীর 'পর চন্দ্রকিরণ যেন শুভ্র রজতের ন্যায় গলে পড়ছে! পৃথিবী যেন আজ নূতন সাজে সেজেছেন! রঞ্জিত ও অমলের মুখে কথা নাই। তারা নীরবে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছিল। এমন সময় বেরসিক টেলিফোনের ঝন্-ঝন্ শব্দ তাদের তন্দ্রা ভেঙ্গে দিলো।

অমল ধড়মড় করে ইজি-চেয়ারে উঠে বসে রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যালো, কে?"

—"আমি অজয়।"

—"তা কি বলছিস?"

—"বলছি যে কাল রাত আটটায় আসছিস ত?"

—"ক'টায় ট্রেণ?"

—"রাত ন'টা কুড়িতে।"

—"আচ্ছা, আমরা তৈরী হয়ে ঠিক সময় পৌঁছুবো।"

রঞ্জিত অমলকে বললে, "শুনলি ত? তবে ঠিক সময় আসতে ভুলিস নি যেন!"

—"আচ্ছা। আজকে তবে বাড়ী যাই। রাত ত অনেক হলো!"

—"তা ত নিশ্চয়ই!"

রবিবার সকাল আটটা।

রঞ্জিত সবে প্রাতরাশ সেরে খবরের কাগজে চোখ দিয়েছে, এমন সময় অমল হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললো, "খুন! আবার খুন!!"

—"খুন!" রঞ্জিতের কণ্ঠে বিস্ময়ের আভাষ,—"এই যে অজয়ও এসেছিস যে! ব্যাপার কি স্পষ্ট করে বল্‌তো? কে খুন হয়েছে?"

—"তবে গোড়া থেকেই বলি শোন্‌! আমি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে একটু বেড়াচ্ছিলাম যদিও আমারই বাগানের মধ্যে; এমন সময় আমার দৃষ্টি খানিকটা রক্তে রঞ্জিত জায়গার ওপর পড়লো দেখে আমার সারা গা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে উঠ্‌লো। রক্তের দাগ আরো খানিক দূর চলে গেছে। অনুসরণ করে দেখি, একজন মৃত লোক—সারা গা সাদা চাদরে ঢাকা—ঠিক পাম্‌-ট্রির তলায় পড়ে রয়েছে।

কোন কিছু না করে আমি তখনই সোজাসুজি এসে থানায় ফোন করলুম। খানিকক্ষণ পরে অমরবাবু এসে তাঁর তদন্ত শেষ করে যখন মৃত লোকটার মুখের চাদর খুলে দিলেন, তখন তাকে দেখে আমার সন্দেহ হতে লাগলো। মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি!

বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল লোকটি কে! এবং আমি তাকে কোথায় দেখেছি!"

রঞ্জিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কে?"

—"লোকটি আইনুদ্দিন খাঁর একজন সহচর, এবং তাকে দেখেছিলাম বাবার ঘরে দেরাজ খুলতে!"

—"বলিস কি?"

—"হ্যাঁ। দেখবি তো চল্ না!"

—"অমল, ড্রাইভারকে বল্ তো মোটরটা বার করুক!"

—"আচ্ছা!"

এর খানিক পরেই দেখতে-দেখতে রঞ্জিতের মোটর অজয়ের বাড়ীর সম্মুখে এসে পৌছুলো।

দরজায় ঢুকতেই অমরবাবুকে দেখে রঞ্জিত বলে উঠ্লো, "অমরবাবু যে! নমস্কার!"

অমরবাবু প্রতি-নমস্কার জানালেন।

—"তা কিছু বুঝতে পারলেন?" রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করলো।

—"বিশেষ কিছু নয়!"

—"কই চলুন তো? কোথায় কি হয়েছে দেখিগে!"

—"এই যে, এদিকে আসুন!"

মৃতদেহ দেখে রঞ্জিত বলে উঠলো, "বড় চালাকি খেলেছে!"

অমরবাবু সঙ্গে-সঙ্গে যেন বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে বললো, "কিছু বুঝতে পারছেন নাকি?"

—"বেশ বুঝতে পারছি! এ খুন হয়েছে বাড়ীর বাইরে, পরে একে এখানে টেনে আনা হয়েছে!"

—"আপনি বুঝলেন কি করে?"

—"এই রক্ত এবং মাটির ওপর একটা হ্যাঁচড়ানির দাগ দেখছেন না? আসুন না! দেখি দাগটা কতদূর গেছে! ঐ দেখুন, দাগ পাঁচিলের কাছে এসে থেমেছে, আবার ঐ দেখুন, পাঁচিলের গায়ও রক্তের দাগ। এবার বুঝতে নিশ্চয়ই দেরী হচ্ছে না?"

—"তা হচ্ছে না বটে!"

—"নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে মারামারির উপক্রম হয়েছিল!"

—"কাদের মধ্যে?"

—"ঐ আইনুদ্দিন খাঁর দলের মধ্যে!"

—"এ লোক কি তারি দলের লোক নাকি?"

—"হ্যাঁ।"

—"মারামারির উপক্রম হয়েছিল কি করে বুঝলেন?"

—"দেখছেন না ওর হাতে একটা ছোরা রয়েছে! বেচারা ছোরা ব্যবহার করবার আগেই রিভলভারের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে!"

সমস্ত ঘটনা নোট-বইয়ে লিখে নিয়ে অমরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আমি তবে যাই? মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করিগে।"

—"বেশ। নমস্কার!"

—"নমস্কার!"

অমরবাবু চলে গেলে রঞ্জিত বলে উঠলো, "বড় চালাকি খেলেছে!!"

—"আবার চালাকি খেলেছে কি!" অমল বিস্ময় প্রকাশ করলো, "আচ্ছা রঞ্জিত, বলতে পারিস ওদের মধ্যে আবার ঝগড়া বাধলো কেন?"

—"তা আর বুঝতে পারছিস না! যাত্রার পূর্ব্বে কে কত ভাগ রত্ন পাবে তাই নিয়েই বোধ হয় ঝগড়া বাধে। তারপর আইনুদ্দিন খাঁ বোধ হয় এমন কথা বলে, যাতে এই লোকটির সম্মান বা স্বার্থে আঘাত লাগে, এবং রাগে অন্ধ হয়ে সে তখন ছোরা দিয়ে মারবার উপক্রম করে। আইনুদ্দিনও ব্যাপার খারাপ দেখে গুলি করতে বাধ্য হয়।"

—"তা তো বুঝলাম; কিন্তু ওকে এখানে আনা হলো কেন?"

—"সেই জন্যই তো বললাম বড় চালাকি খেলেছে! আইনুদ্দিন খাঁ দেখলো, লোকটাকে তো গুলি করে মেরে ফেললুম। এখনি তো পুলিশে জানাজানি হয়ে যাবে। তা এক কাজ করা যাক্ না কেন? একে হরিহরবাবুর বাড়ীতে রেখে এলে তো এক ঢিলে দুটো পাখি মারা যায়!

গোয়েন্দা দুটি তো ও-বাড়ীতে আসছেই। এসে এই রকম হঠাৎ একটা মৃতদেহ দেখলে নিশ্চয়ই তদন্তের ভার ঘাড়ে নেবে। কজেই পুলিশের মনোযোগ কতকটা আবার এক নতুন খুনের কেসে আকৃষ্ট হবে।"

—"আমরা যে বুঝে নিয়েছি এই লোক তারই, একথা কি সে বুঝতে পারে নি?"

—"তা কখনো পারে? তা ছাড়া, আরো একটা বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, না?"

—"কি রকম?"

—"বুঝতে পারছিস না? মড়া তো সে রাস্তায় ফেলে রাখতে পারতো। কিন্তু সে তদন্ত যদি না করি? তাই একেবারে তোর বাগানে এনে ফেলেছে!"

—"কিন্তু তাতেই বা কি করতে পারলো? এক দেখাতেই তো তদন্ত শেষ।"

—"হাঁ, কতকটা তাই বটে! তা যাক্। অজয়, এখন বাড়ী যাওয়া যাক্। রাত্রি আটটায় দেখা হবে।"

—"আচ্ছা।"

তেরো

রবিবার বিকাল পাঁচটা।

রঞ্জিত মদনকে ডেকে বললো, "সব তৈরি তো?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!"

—"রাঘব যে আজ বড় আমার কাছে নেই! কোথায় সে?"

—"সে তো আপনার শোবার ঘরে ঘুমুচ্ছে!"

—"তাকে ডেকে আনতে পারো?"

—"ডাকতে হবে না বাবু! ঐ যে সে আসছে!"

রাঘব লম্বা-লম্বা গোটা-কতক হাই তুলে অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে লেজ নাড়তে-নাড়তে রঞ্জিতের পায়ের কাছে এসে বসলো।

রঞ্জিত বললো, "কি রে রাঘব! আর চার ঘণ্টা পরেই যে আমরা অন্য দেশে যাব। তুই যাবি ত রে?"

রাঘব আর একটা হাই তুলে সম্মতি জানালো।

—"তুই না গেলে আমার যে কোন কাজ হয় না রে! তুই যে আমার ডান হাত!"

অধিক প্রশংসা পেয়ে রাঘব গর্-গর্ করতে লাগলো।

—"মদন! খেয়ে দেয়ে তৈরি হয়ে নাও! আর প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে আমাদের বেরুতে হবে।"

—"আমি তৈরি বাবু!"

—"তা না হলে আমার চাকর হওয়া যায়? তবে আমার খাবারটা দিয়ে যাও!"

—"এই যে দিই বাবু!"

রঞ্জিত সবে খাবারে মুখ দিয়েছে এমন সময় অমল দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। তাকে দেখতে ঠিক যেন এক-জন জিপ্‌সির মতন! তার দু'-কাঁধের দু'-পাশ দিয়ে ঝুলছে দুটি ব্যাগ, একটি জলের বোতল, একটি ফ্লাস্ক। সর্ব্বোপরি দু হাতে দুই টিনের কৌটো।

রঞ্জিত এ-সব দেখে বললো, "এই রকম লট্‌-বহর নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস রে?"

—"যে দিকে দু' চোখ যায়!"

—"আপাততঃ তো ঐ চেয়ারে উপবেশন কর্। আমি ততক্ষণে খেয়ে নিই!"

—"জানিস, মা কিন্তু কিছুতেই ছাড়লে না। সঙ্গে দু' কৌটো লুচি আর আলুর দম দিলে। বললে, 'পথে ক্ষিদে পাবে রে, নিয়ে যা!' কি আর করি! নিয়ে আসতে বাধ্য হলুম।"

—"তা তিনি খারাপ করেছেন কি? আমিও কিছু নিয়েছি।"

—"তুই আবার কি নিয়েছিস?"

—"বিশেষ কিছু নয়! এই দু' টিন পান্তুয়া আর দু' টিন বিস্কুট—একটি যদিও রাঘবের জন্য।"

এই রকম কথাবার্ত্তার মাঝে রাত সাতটা বাজলো।

—"আর মাত্র এক ঘণ্টা, তারপর আমরা অজয়ের বাড়ী যাব।"

—"সে তো জানি!"

—"আর একবার মনে করিয়ে দিতে দোষ কি?"

—"আচ্ছা রঞ্জিত, জায়গাটার নাম কি?"

—"কোন্ জায়গা?"

—"ঐ যেখানে গুপ্ত রত্নের সন্ধান পাওয়া গেছে—মানে আমরা আজ যেখানে যাব?"

—"ও! টঙ্গি!"

—"তা অজয় ওখানে কখনো গেছে কি?"

—"বোধ হয়, না।"

—"তবে যাবি কি করে?"

—"সে ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে।"

—"লোকদের জিজ্ঞাসা করতে-করতে যাবি?"

—"শেষ অবধি হয়তো তাই করতে হবে!"

—"আমরা কে কে যাব?"

—"তাও বুঝি এখনো জানিস না? এই আমরা দু'জন, অজয়, মদন আর আমাদের চিরকালের সাথী ঐ রাঘব।"

—"রাঘবকে তো ভ্যানে নিয়ে যেতে হবে! কিন্তু ও যে তা মোটেই পছন্দ করে না!"

—"পছন্দ না করলে কি করবে? ও ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই।"

রাত ঠিক আটটার সময় রঞ্জিত সকলকে নিয়ে অজয়ের বাড়ী উপস্থিত হলো!

অজয় তাদের জন্য ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করছিল। রঞ্জিতকে ঢুকতে দেখে সে বলে উঠলো, "খুব সময় মত এসেছিস্ তো তুই! একদম ঠিক আটটায় এসে পৌঁছেছিস!"

—"হাঁ, আমি তো এসেছি! তুই তৈরি তো?"

—"হ্যাঁ।"

—"তবে বেরুনো যাক্!"

—"কিসে যাবি?"

—"সে তোকে ভাবতে হবে না। আমার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

—"তবে চল্!"

রঞ্জিত সকলকে নিয়ে গাড়িতে উঠলো। দেখতে-দেখতে গাড়ি কলকাতার জন-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজ গন্তব্য স্থান শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলো।

রঞ্জিত সকলের সাথে গাড়ি হতে নেমে পড়লো, এবং ড্রাইভারকে হুকুম দিল, "গাড়ি বাড়ীতে নিয়ে যাও।"

—"যে আজ্ঞে।"

রঞ্জিত ও সকলে ষ্টেশনে প্রবেশ করলো। সকলকে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে বলে রঞ্জিত চারখানা ঢাকার টিকিট কিনতে ও রাঘবের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

তখনও ট্রেণ ছাড়তে প্রায় তিন কোয়ার্টার বাকি ছিল।

ষ্টেশন লোক-সমাগমে পূর্ণ। এমন সময় রঞ্জিত টিকিট কিনে ফিরে এসে বললো, "চল্, এবার ট্রেণে ওঠা যাক্।"

—"এত তাড়াতাড়ি?" অমল অবুঝের মত প্রশ্ন করলো।

—"জায়গা পেলে হয়, আবার তাড়াতাড়ি!"

—"আচ্ছা, তবে চল্।"

সকলে সে স্থান ছেড়ে প্ল্যাট্‌ফর্‌মে ঢুকতে রঞ্জিত বলে উঠলো, "আগে রাঘবের ব্যবস্থা করা যাক্। তোরা একটু দাঁড়া এখানে, আমি রাঘবকে তুলে দিয়ে আসি।" এই বলে রঞ্জিত রাঘবকে নিয়ে ভ্যান্ অভিমুখে চললো।

কার্ডে লেখা ছিল পাঁচ নম্বর ভ্যান। কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর পাঁচ নম্বরের ভ্যান পাওয়া গেল।

রঞ্জিত রাঘবকে তুলে দিয়ে তার গা চাপড়াতে-চাপড়াতে বললো, "আমরা পাশের কামরায় আছি রে। কোন ভয় নেই! আমাদের না দেখতে পেয়ে তোর মন কেমন করবে সত্যি, কিন্তু উপায় কি? তবে যাই? তুই ঘুমিয়ে পড়।"

রাঘব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় নাড়লো।

তারপর রঞ্জিত সকলকে নিয়ে একটি ছোট সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে দেখলো, তার আগে আরও দুজন ভদ্রলোক যে যার স্থান দখল করে বসে আছেন।

তাতে তাদের কোন ক্ষতি হলো না। চার জনের বসবার মত জায়গা যথেষ্টই ছিল।

মদন দেখতে-দেখতে চারটা বিছানা পেতে ফেললো।

রঞ্জিত কামরার দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে নিজের বিছানায় উপবেশন করলো, এবং পূর্ব্বোক্ত লোক দুটির সহিত পরিচিত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো।

লোক দুটিও নিজেদের পরিচয় দিতে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল! কিন্তু কে আগে কথা বলবে, তাই নিয়ে গোলযোগ বাধলো।

অমল তা লক্ষ্য করে লোক দুটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের নাম জানতে পারি কি?"

—"আমাদের বলছেন?" তাদের একজন জবাব দিল।

—"হ্যাঁ। আপনাদের।"

—"নাম জিজ্ঞাসা করছেন তো?"

—"হ্যাঁ।"

—"আমার নাম তারক মণ্ডল। আর ওর নাম সত্য সাহা।"

রঞ্জিতের মনে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হলো। সে মনে-মনে ভাবলো, লোক দুটির কথাবার্ত্তায় ও আচার-ব্যবহারে পূব-দেশীয় ভাব; আমাদের সাথেই শেষ পর্য্যন্ত যাবে কি না, কে জানে? পরক্ষণেই অমলের প্রশ্নের উত্তরে তাকে আর ওরকম ভাবতে হলো না!

অমল প্রশ্ন করলো,—"আপনাদের নিবাস?"

—"আজ্ঞে ঢাকার দক্ষিণে শুভড্যা গ্রামে।"

—"এখানে কোথায় ছিলেন?"

—"পাঁচু খানসামা লেন, খুলনা হোটেলে!"

—"কি পেশা আপনাদের ?"

—"আজ্ঞে আমরা দুই বন্ধুতে ঢাকার বিখ্যাত শাঁখার ব্যবসা করি। ঢাকা থেকে মাল নিয়ে আমাদের মাসে প্রায় দু'-তিন বার যাওয়া-আসা করতে হয়। কলকাতায় আমাদের দেশীয় মহাজনের দোকান আছে। সেখানে মাল লেন্-দেন্ হয়। আমাদের পরিচয় তো শুনলেন, এবার আপনাদের পরিচয়টা দিন।"

—"ও! আমার নাম অমল কিশোর ঘোষ। সম্প্রতি বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়ছি। এঁরা দুজনে আমার বিশিষ্ট বন্ধু। রঞ্জিতবাবু সম্প্রতি ডাক্তার হয়েছেন। আর অজয় সরকার? সে তো আমারই সহপাঠী। আর বিছানা যে পেতেছে, তার নাম মদন দাস। রঞ্জিতের পুরানো আমলের চাকর!"

—"আপনাদের গতি কতদূর ?"

—"ঐ যে ঢাকার অন্তর্গত টঙ্গি বলে একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে না, তাই দেখতে।"

—"ও! টঙ্গি!"

—"আপনি ওখানকার বিষয় কিছু জানেন নাকি ?"

—"তা বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে কিছু-কিছু শুনেছি বৈকি!"

চৌদ্দ

সহসা ষ্টেশনে ঠং-ঠং করে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো।

রঞ্জিত ঘড়িতে দেখলো ঠিক ন'টা বেজে কুড়ি হয়েছে।

—"গাড়ি ছাড়লো!" রঞ্জিত বললো।

সঙ্গে-সঙ্গে গার্ডের বাঁশিও বেজে উঠ্‌লো।

গাড়ি ঈষৎ নড়ে উঠ্‌লো, এবং যাত্রাধ্বনি শুনিয়ে আস্তে-আস্তে অজগরের ন্যায় বক্রগতিতে ষ্টেশন ত্যাগ করে গন্তব্য স্থানে পা বাড়ালো।

চারদিকের অন্ধকার ভেদ করে ট্রেণের হেড-লাইট্ তীব্র আলোতে পথ দেখিয়ে চললো। ক্রমে-ক্রমে ট্রেণের গতি বাড়তে লাগলো এবং শেষে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললো। কেবল একটা বিশ্রী ঝক্-ঝক্ ঝিক্-ঝিক্ আওয়াজ সকলের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

দেখতে-দেখতে এক ফালি চাঁদ আকাশের গায় ভেসে উঠ্‌লো! সে তার যথাসাধ্য জ্যোৎস্না দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মনে হলো, তা অতি ক্ষীণ! তবু 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল!' একেবারে চারদিক্ ঘুট্-ঘুটে অন্ধকার ছিল, এখন তবু আধো-অন্ধকার আধো-আলো বিরাজ করছে!

আকাশের কালো-কালো মেঘগুলির যাত্রাপথে চাঁদ

পড়লে তারা প্রথমে চাঁদকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই তাকে মুক্তি দিয়ে চলে যেতো।

রঞ্জিত সকলের সাক্ষাতেই অমলকে বলে উঠলো,—"চাঁদের এমন রূপ দেখে আমার রবি ঠাকুরের সেই গানটা মনে পড়ছে!"

—"কোন্‌টা?"

—"তবে শোন্!"—

রঞ্জিত গুন্-গুন্ করে সুর ভেঁজে নিয়ে আরম্ভ করলো—

"চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উথ্‌লে পড়ে আলো,
ও রজনী-গন্ধা, তোমার গন্ধ সুধা ঢালো!"

—"আমারও যদিও গাইতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তোর মত তো আর বিশ্বকবির গান আমি জানি না! আমি যেমন লোক সেই রকম সঙ্গীত-রচয়িতার একটি গান গাই, শোন্—

এই যে বাঁকা চাঁদ, আর এই যে সাঁঝের তারা,
আজ মনে হয় কত কালের চেনা যেন তারা!—"

—"যাক্ অনেক ছেলেখেলা হয়ে গেল। এবার গল্প শোনা যাক্।"

—"গল্প বল্‌বে কে? তুই?" অমল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রঞ্জিতের দিকে তাকালো!

—"এর মধ্যে ভুলে গেলি? তারকবাবু বল্‌ছিলেন না যে, তিনি টঙ্গির সম্বন্ধে অনেক কিছু তাঁর পিতা-পিতামহের নিকট

হ'তে শুনেছেন! আর, তাঁকে ঐ সম্বন্ধে গল্প বল্‌তে অনুরোধ করি ?"

—"না, না, অনুরোধ আবার কি! আপনাদের মতন লোককে গল্প বল্‌বো, আপনারা শুন্‌বেন, এটা কি আমাদের সৌভাগ্য নয় ?" তারকবাবুর মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ।

—"আপনি অমন করে বল্‌বেন না! নিন্‌ গল্প আরম্ভ করুন তো ?"

তারকবাবু ভাল হয়ে নড়ে-চড়ে বসে নিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন।

—"মীরজুমলার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন! ইতিহাসে নিশ্চয়ই তা পড়ে থাকবেন !"

—"কি বল্‌লেন মীরজুমলা! মীরজুমলা'! মনে পড়েছে! তিনি গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ও ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করলে মীরজুমলা তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ সৈয়দ, ইনি ছিলেন পারসিক। ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসে ইনি জহরতের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লা কুতুব শাহ তাঁর বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। তারপর ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডার সুলতানের সাথে সন্ধি স্থাপন করলে ঐ বৎসরেই মীরজুমলা মোগল-রাজের প্রধান মন্ত্রী হন।

ঔরঙ্গজেব সিংহাসনারোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ভ্রাতৃ-বিরোধের সময় মীরজুমলা ছিলেন

তাঁর ডান হাত! তাই ঔরঙ্গজেব তাঁকে বাংলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করলেন।…"

—"এইবার শুনুন…"

—"এইটিই কি তাঁর আগেকার ইতিহাস নয়?"

—"হ্যাঁ! আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার গল্প আরম্ভ হবে ঐ শাসনকর্ত্তা হবার পর থেকে!"

—"ও! তাই বলুন।" রঞ্জিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

—"তখন ঢাকা ছিল একটি বিখ্যাত সহর। মীরজুমলা এখানে এসে অনেক মন্দির, দুর্গ, সেতু, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্ম্মাণ করান। আপনারা টঙ্গিতে যাচ্ছেন তো?"

—"হ্যাঁ।"

—"গেলে দেখতে পাবেন এখনও তার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।"

—"ও! তাহ'লে আমরা বেশ জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি তো?"

—"তোর খোরাক জুটবে, কিন্তু আমাদের কি হবে…?" অমল ঈষৎ মুখ ঘুরিয়ে বললে।

রঞ্জিত বলল, "আচ্ছা তারকবাবু! টঙ্গির শেষ জমিদারের নাম কি?"

—"শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

—"তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

—"বিশেষ কিছু জানি না। তবে যা জানি, বলছি।

ওঁরা পুরুষানুক্রমে নাকি একটি গুপ্তধন পেয়ে আসছিলেন। শেষ জমিদার শিবনারায়ণ পর্য্যন্ত সে জিনিষটি পেয়েছিলেন; কিন্তু এই শিবনারায়ণ বাবু ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তিনি যে কাকে দিয়ে গেছেন, তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"

—"আপনি এসব জানলেন কি করে?"

—"আমি কেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খুব কম লোকই আছে যারা এ বিষয় জানে না। আমি এ বিষয় শুনেছি আমার পিতা-পিতামহের নিকট হ'তে। তাঁরাও নাকি আবার তাঁদের পিতা-পিতামহদের কাছ থেকে শুনেছেন। বুঝলেন?"

—"শেষ জমিদার আজ কতদিন হ'লো গত হয়েছেন?"

—"তা প্রায় বিশ বছরের কম তো নয়!"

—"এখন সেই জমিদার-বাড়িতে কেউ বাস করে? না, খালি পড়ে আছে?"

—"বাস করে বৈকি! কেউ নিশ্চয়ই বাস করে!"

—"কারা?"

—"কারা আবার! ভূত—ভূত!"

—"আপনি ভূত বিশ্বাস করেন নাকি?"

—"তা একটু করি বৈকি!"

—"এখন সে বাড়ি নিশ্চয়ই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।"

—"তা আর বলতে!"

পনেরো

সকাল সাড়ে ছ'টা। ট্রেণ এসে গোয়ালন্দ স্টেশনে থামল্।

স্টেশনটি বেশ বড়। গাড়ি এখানে আধ ঘণ্টা থামে। টঙ্গি যেতে হলে ট্রেণ ছেড়ে জাহাজে উঠতে হয়।

অনেক যাত্রী ট্রেণ থেকে নেমে গেল। রঞ্জিত সকলকে নিয়ে ট্রেণ থেকে নেমে রাঘবের কার্ডটি নিয়ে স্টেশন-ঘরের দিকে অগ্রসর হলো। স্টেশন-মাস্টারকে কার্ড দেখিয়ে রঞ্জিত রাঘবকে মুক্ত করলো।

রাঘব তাদের দেখতে পেয়ে যেন অন্ধকার থেকে আলোয় ছুটে এলো! সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো! সকলকে দেখে তার আনন্দের আর সীমা রইলো না।

রঞ্জিত সকলকে নিয়ে সবে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করেছে—ইচ্ছা, কিছু খাবে, এমন সময় অমল এমন এক জিনিষ দেখলো যাতে তার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো।

সে একরকম দিশেহারা হয়ে রঞ্জিতের জামার পেছনে একটা টান্ দিয়ে তাকে চুপি-চুপি উত্তেজিত ভাবে বললে, "রঞ্জিত, ঐ ছাখ্! গাড়ির সেই তারক মণ্ডল মশাই মাল-গাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা বিশ্রী কদাকার লোকের সাথে কি কথা বলছে! কিন্তু যার সঙ্গে কথা বলছে, সে

লোকটাকে আমি আরো কয়েকদিন কলকাতায় দেখেছি এস্. কে. সিংহের দোকানে।

ঐ দোকান থেকে সে প্রায়ই দু-চার ভরি করে সোনা কিনে নিয়ে যেতো। আমার একদিনের কথা মনে আছে। সেদিন ওর সাথে ভদ্রশ্রেণীর একজন লোক ছিলেন। এই লোকটার ইচ্ছা ছিল গিনি সোনা কেনে; কিন্তু তিনি বলছিলেন, 'সোনা ভাল কি মন্দ, সে আমি দেখে নেবো। আপনি জহুরী— স্বর্ণকার; আপনি আপনার মজুরী পেলেই তো হলো! আমি গিনি সোনা নেবো না, আমি আসল সোনাই কিনে দিচ্ছি।'

সেই স্বর্ণকারকে এখানে দেখে, অমন চুপি-চুপি আলাপ করতে দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে রঞ্জিত! ঐ ছাখ্, ওরা আরো আড়ালে সরে গেল! বোধ হয় আমাদের লুকিয়েই কোন আলাপ করতে চায়!"

রঞ্জিত একবার ভাল করে লোক দু'জনকে দেখে নিলে; তারপর গম্ভীর ভাবে বললে, "একটু সাবধান থাকিস অমল, সম্ভবতঃ এতক্ষণে আমরা আসল সূর্য্যকান্তের দেখা পেলুম!"

অমল বললে, "তোর আসল পরিচয়টা দিয়ে এখানে রেলওয়ে-পুলিশের একটু সাহায্য চেয়ে দেখবি রঞ্জিত! তারা ঐ লোক দুটোকে একটু চোখে-চোখে রাখতে পারে। আগে এই কাজটা করে আয়, তারপর কিছু খাবার কিনে নিয়ে চল্ জাহাজে উঠে পড়ি।

সাথে যা খাবার আছে, তাই দিয়ে তো আর সারাদিন

যাবে না ! জাহাজে কেনার চেয়ে এই ষ্টেশনে কেনাই অনেক ভাল। কাজেই তুই বরং আগে—"

সহসা অমলের কাঁধে পড়লো এক প্রচণ্ড আঘাত, আর রঞ্জিতেরও মুখের ওপর এসে পড়লো এক ভয়ানক ঘুসি।

সম্ভবতঃ অজয়ের মাথায়ও একখানা পাথর এসে পড়তো, কিন্তু অজয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অমলকে রক্ষা করবার জন্য তার বাঁ-হাতখানা তুলে দিয়েছিল। তাইতে অমলের মাথাটা বেঁচে গেল, আর অজয়ের উদ্দেশ্যে যে পাথরখানা এসেছিল, সেইখানা দড়াম্ করে শুধু ভূমিতলে আঘাত করেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল !

কিন্তু রঞ্জিতের আঘাতটা প্রচণ্ড ভাবেই তার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। সে টাল সাম্‌লাতে না পেরে পেছনে হটে গেল। প্ল্যাটফরমের লোহার রডে আঘাত খেয়ে মাথার কিছু অংশ তার ফেটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সে অচৈতন্য হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লো।

সকলে এই সব দেখে রঞ্জিতের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। কারো দৃষ্টি তখন আর সেই সূর্য্যকান্ত বা আইনুদ্দিন খাঁর ওপর ছিল না। সে ও তারক মণ্ডল তার অন্য সাথীকে নিয়ে তখন পলায়নে রত; কিন্তু প্রভুভক্ত কুকুর রাঘব প্রভুর এরূপ শোচনীয় পরাজয়ে মুষড়ে পড়লো না। সে প্রাণপণে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে চল্‌লো।

আইনুদ্দিন খাঁও পশ্চাতে শত্রু দেখতে পেয়ে প্রাণপণে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চললো; কিন্তু সহসা এক

পাথরের ঢিপিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং উঠবার আগেই রাঘব তার নিকটে এসে পড়লো ও তার পা কামড়ে ধরলো।

আইনুদ্দিনও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পকেট থেকে রিভলভার বার করে রাঘবকে গুলি করলো।

কিন্তু রাঘব তখন ছুটছিল; কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। গুলি এসে রাঘবের পায়ে আঘাত করলো। রাঘব একটা আর্ত্ত চীৎকার করে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে রক্তাক্ত কলেবরে প্রভুর কাছে ফিরে এলো।

রঞ্জিতের তখন জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সে রাঘবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল,—"কেবলমাত্র তুইই আমার প্রতিশোধ নিলি রাঘব! কিন্তু তোর নিজের অবস্থাই বড় সঙ্গিন! যা অমল, একে ধুইয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দে।"

এমন সময় খবর পেয়ে গোটা-কয়েক সিপাই নিয়ে এক দারোগাবাবু সেখানে ছুটে এলেন।

দারোগা বিজয়বাবু বল্‌লেন,—"চোর ভেগেছে তো? সে আমি জানিই! আসতে একটু দেরী হয়ে গেল কি না! তা না হলে বাছাধনকে ঠিক শ্রীঘরে বাস করাতুম। কিন্তু কি করবো, আপনারা কেউ ওকে ধরে রাখতে পারলেন না!"

দারোগাবাবু যেমনি এসেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই আবার তাঁর সিপাইদের নিয়ে চলে গেলেন!

রঞ্জিত ঘৃণাজড়িত স্বরে বলল, "অমল! সব দারোগাকেই

ভগবান একই ধাতুতে প্রস্তুত করেছেন। আমি এ পর্য্যন্ত এমন একটা দারোগা দেখলুম না যার একটু বুদ্ধি আছে !"

অমল বলল, "সেজন্য দুঃখু করে কি হবে ? তুই বড্ড উত্তেজিত হয়েছিস্ ! চল্ এখন আস্তে-আস্তে জাহাজে যাই। জাহাজ ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি।"

সকলে রঞ্জিতকে নিয়ে আস্তে-আস্তে জাহাজে উঠলো। খানিকক্ষণ পরে জাহাজ ছেড়ে দিল।

জমিতে লাঙ্গল দিয়ে যেমন কর্ষণ করা হয়, জাহাজও তেমনি নদীর জলকে কর্ষণ করে তীরবেগে এগিয়ে চললো। তার গন্তব্যস্থল নারায়ণগঞ্জ।

ষোল

বিকেল ছ'টা। ট্রেণ এসে টঙ্গি ষ্টেশনে থামলো।

ষ্টেশনটি ছোট। ষ্টেশন-ঘরের টিনের চালার ওপর রৌদ্র পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে।

ট্রেণে যাত্রীদের ওঠা-নামার তাড়াহুড়া পড়ে গেল। সকলের কথাবার্ত্তায় ছোট ষ্টেশনটি মুখরিত হয়ে উঠলো। রঞ্জিত সকলের সাথে গাড়ি হতে নেমে পড়লো।

সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত ধান-জমি। চাষীরা তাদের নিত্য-কর্ম্ম সেরে যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। রাখালেরা গরু তাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জিত বলে উঠ্‌লো,—"চল্ ষ্টেশনে গিয়ে জমিদার-বাড়ীর ঠিকানাটা সংগ্রহ করি!"

—"আচ্ছা, চল্," অমল সম্মতি জানায়।

সকলে ষ্টেশন-ঘরে প্রবেশ করতে একজন তাদেরই বয়সী ছেলে বলে উঠলো,—"আপনারা কাকে খুঁজছেন?"

—"খুঁজিনি কাউকেই। আপনি একটু বাইরে আসুন না? কথা আছে।"

ছেলেটি বাইরে এলে রঞ্জিত তাকে অতি ধীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো,—"আচ্ছা বলতে পারেন এখানে জমিদার

শিবনারায়ণ বাবুর বাড়ীটা কোথায় ? যদি দয়া করে দেখিয়ে দেন, তাহ'লে বাধিত হব।"

কথাগুলো শুনে ছেলেটির মুখের যা ভাব হলো, তা বর্ণনা করা কঠিন।

সে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে বললে, "কেন বলুন তো ? সে জমিদার তো আজ অনেকদিন হলো মারা গেছেন। আর সে বাড়ীতে এখন তো কেউ বাস করে না।"

ছেলেটির কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গি দেখে রঞ্জিতের মনের সন্দেহ ঘুচলো। শত্রুপক্ষের যে এ কেউ নয়, তাতে সন্দেহ নেই।

রঞ্জিত বিজ্ঞের মতন প্রশ্ন করলো, "কথাগুলো শুনে বিস্মিত হবার কি কোন কারণ আছে ?"

—"আমি বিস্মিত হচ্ছি কেন জানেন ? ঐ জমিদার-বাড়ী নিয়ে এখন একটা ভীষণ রহস্য চলেছে। আপনারাও কি তার সন্ধান পেয়েছেন নাকি ?"

—"কার সন্ধান ?"

—"কোন গুপ্তধনের ?"

—"ঠিক ধরেছেন দেখছি। তাহলে এখন এটা বিশ্বাস করতে পারি যে আপনি শত্রুপক্ষের নন্।"

—"তা করতে পারেন। কেন না, একদিন যদিও আমি শত্রুপক্ষেরই একজন ছিলাম, কিন্তু আজ আর আমি শত্রুপক্ষের নই—এখন মিত্রপক্ষের।"

—"আপনি আবার কোনদিন শত্রুপক্ষে ছিলেন নাকি ?"

—"ছিলাম বৈকি ! ঐ যে কি নামটা যেন তার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আইনুদ্দিন খাঁর।"

—"আইনুদ্দিন খাঁ !!"

সকলের একবার চকিতে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে নিলে।

—"তা আপনি ও-দলে গেলেন কি করে ?"

—"দাঁড়ান বলছি ! আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনারা এখানে থাকবেন কোথায় ?"

—"কোথায় আবার ? জমিদার-বাড়ীর কাছাকাছি কোন জায়গায় তাঁবু ফেলে থাকবো।"

—"কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা বলি।"

—"বেশ, বলুন।"

—"এরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন আলাপ হলো, আমি তখন আপনার কাজে সাহায্যও তো করতে পারি। তাই বলছি, চলুন না আমার বাড়ীতে ! আমার বাড়ীও জমিদার-বাড়ীর কাছেই।"

—"উত্তম প্রস্তাব। চলুন।"

সকলে ষ্টেশন ত্যাগ করে মাঠের পথ বেয়ে চললো।

—"আগে পরিচয়টা হয়ে যাক্। প্রথমে আমার নামও পেশা শুনে নিন্। আমার নাম অজিতকুমার হালদার। বি. এ. পাশ করে বসে আছি। এবার আপনাদের পরিচয় বলুন।"

রঞ্জিত তাদের পরিচয় দান করলো।

—"আচ্ছা, এবার আমার গল্প শুনুন। ঐ জমিদার শিবনারায়ণের অধীনে আমার মামা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কেরাণীর কাজ করতেন। আমার ঐ মামা ছাড়া জগতে আর কেউ ছিল না। আর মামাও ছিলেন বিপত্নীক। কোন ছেলেপুলেও ছিল না। সুতরাং মামা আমাকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছিলেন। এদিকে ঐ জমিদার-বংশ পুরুষানুক্রমে এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে আসছিল। কিন্তু তিনি নিঃসন্তান থাকায় ঐ সন্ধান আমার মামা পান।

গুপ্তধনের প্রধান উৎসই ছিল একটি ডায়েরী ও একটি নক্সা। আমি প্রায় রোজই লক্ষ্য করতুম, মামা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট ডায়েরীর মতন বই নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। আমার মনেও কৌতূহলের উদ্রেক হলো। একদিন রাত্রে ঐ ডায়েরী চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলুম। মামা আমাকে তিরস্কার করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।"

—"তারপর আপনি কোথায় গেলেন?"

—"ঐ টঙ্গি ষ্টেশনে যে এখন মাষ্টার, ও আর আমি এক সঙ্গেই ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। ওই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। আমি চুপ করে বসে ছিলাম না—খালি সুযোগ খুঁজছিলাম, কি করে ঐ জিনিষটা করায়ত্ত করা যায়। শীঘ্রই সুযোগ মিললো। মনে-মনে ঠিক করলাম, ও আমার কর্ম্ম নয়—কারো সাহায্য নিতে হবে। ঠিক করলাম, কমল থাঁর কাছে যাব।"

—"কমল খাঁ কে ?"

—"তাকে আপনারা চিনবেন কি করে ? সে এখানকার গুণ্ডার সর্দ্দার। তার পেশা, কেউ সাহায্য চাইলে সাহায্য করা।"

—"ঠিক বুঝলাম না, ভাল করে বলুন।"

—"মানে, মনে করুন, তার হাতে অনেক লোক। সে কোন গুপ্ত কিছুর সংবাদ পেলে নিজে তাতে হস্তক্ষেপ করে না ; কিন্তু সে চায় প্রতিপত্তি ও সম্মান। পরকে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নেয়। তার এক বড় মনিব আছে, সে সেই মনিবের কাছ থেকে মাসিক বৃত্তিও ভোগ করে থাকে।"

—"সেই বড় মনিবের নাম কি জানো ?"

—"কেন জানবো না ! ঐ যে আপনাদের কলকাতারই এক জহুরী সূর্য্যকান্ত সিংহ, আসল নাম আইনুদ্দিন খাঁ !"

—"আপনি বোধ হয় ঐ দলেই ছিলেন ?" রঞ্জিত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—"ঠিক বলেছেন। আমি ঐ দলেই ছিলুম। আমারই সাহায্যে ওরা হরিহরবাবুর কাছ থেকে ডায়েরী হস্তগত করে।"

হরিহরবাবুর নাম শুনতেই অজয় বলে উঠলো, "আপনি নিশ্চয়ই শুনে আনন্দিত হবেন যে, আমিই সেই হরিহরবাবুর পুত্র অজয়।"

—"তাই নাকি ! আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।"

সকলেই একবার প্রাণ-খোলা হাসি হেসে নিলে।

রঞ্জিত কথার খেই ছেড়ে যাচ্ছে বলে, তখনই বলে উঠলো, "তা আপনি ঐ দলচ্যুত হলেন কি করে?"

—"আর বলেন কেন! হাজার হোক্, ভদ্রলোকের ছেলে তো! ছোট লোকদের সঙ্গে সইবে কেন? একদিন আইনুদ্দিন খাঁ এমন একটা কথা বলে, যাতে আমার পিত্তি চমকে ওঠে! যদিও সেই কথাই আমাকে সুপথে এনেছে।"

—"সে এমন কি বললো যাতে আপনার···"

—"নেহাৎ শুনবেনই? তবে শুনুন। সে বলে, 'কেন বাপু ভদ্রলোকের ছেলে! লেখাপড়া শিখেছ, বয়সও তো বড় কম নয়। তা এমন মতিবুদ্ধি হলো কেন? নিজের ধন পরের হাতে তুলে দিলে কেন? তা বেশ করেছ। যখন পরের হাতে তুলেই দিয়েছ, তখন মানে-মানে কেটে পড় দিকিনি।'

শুনে আমার গা রাগে রি-রি করে উঠেছিল। আমি সেদিন বুক ফুলিয়ে তাকে বলেছিলাম, 'বেশ দেখে নেব।' সে তা শুনে অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেছিল,

'কত হাতী গেল তল,
মশা বলে কত জল!

'যাও, যাও—তুমি তো তুমি! অমন কত কলকাতার নাম-করা গোয়েন্দারা হিম্-শিম খেয়ে গেল!'

সেই থেকে আমি প্রতিশোধ নেব বলে রোজ খাওয়া-

দাওয়ার চেয়ে প্রতি ট্রেণ দেখাই আমার বড় কাজ বলে মনে করে নিয়েছি।

বিশেষতঃ সম্প্রতি সে এমন একটা কাজ করেছে, যা মনে হলে প্রতিহিংসার জন্য আমি উন্মত্ত হয়ে উঠি।

কাজটা কি জানেন? ঐ সূর্য্যকান্ত বা আইনুদ্দিনের দলে 'ডাব্বু' নামে একটা লোক ছিল। সে ছিল অসাধারণ সাহসী ও সরল। আমি তাকে খুব বেশী ভালবাসতাম। কিন্তু আইনুদ্দিন তাকে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে! শুধু তাই নয়, হত্যাকাণ্ডটা যাতে এই হরিহরবাবুর ছেলের কাঁধে কোনরকমে চাপানো যায়, সেই আশায় লাশটাকে সে ফেলেও রেখেছিল হরিহরবাবুরই বাড়ীর এক নির্জ্জন অংশে।

কেমন অজয়বাবু, আমার কথাটা সত্যি কি না? আপনি তো সে বাড়ীতেই থাকেন!"

অজয় নীরবে মাথা নেড়ে স্বীকার করে গেল; অমল ও রঞ্জিতের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল।

রঞ্জিত বলল, "কিন্তু আপনি রোজ আজকাল ষ্টেশনে আসছেন কেন?"

—"আমি তারই আশায়-আশায় ষ্টেশনে আসি।"

—"কার আশায়?"

—"ঐ আইনুদ্দিন খাঁর। আজ রাত্রেই সেই প্রতিশোধ নেব। বেশী দেরী করা উচিত নয়, যত শীঘ্র পারা যায়, ততই মঙ্গল।"

—"আপনি তাকে এখন কোথায় পাচ্ছেন?"

—"কেন, সেও তো আপনাদের সঙ্গে এক ট্রেনেই এসেছে!"

—"তা কি ভাবে প্রতিশোধ নেবেন ঠিক করেছেন? তাকে হত্যা করে?"

—"এক রকম তাই। তবে তাকে প্রাণে মারবো না, কিন্তু তার সঙ্গীদের কচুকাটা করবো।

আপনারা বোধ হয় জানেন না, এখানে ভাড়াটে গুণ্ডার দল পাওয়া যায়। আমিও সেইরকম একদল ঠিক করে রেখেছি, এবং বলা-কওয়াও ঠিক হয়ে গেছে। আজ রাত্রেই মজাটা দেখতে পাবেন।"

সতেরো

থম্‌থমে রাত। চারদিক নিস্তব্ধ।

আইনুদ্দিন খাঁর দল জমিদার-বাড়ীতেই আস্তানা গেড়েছে। তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে তাদের মরণ শিয়রে. অজিতের ভাড়াটে গুণ্ডার দল শুধু একটি কথার অপেক্ষায় বসে আছে! তারপরেই হবে সব শেষ!

রঞ্জিত বললো,—"এই রকম অমানুষিক অত্যাচার করা কি ভাল হবে? ওরা শুধু রক্ত-তৃষায় পাগল হয়ে আপনাকে অপমান করেছে। তা বলে কি তার প্রতিশোধ এই রকম নিষ্ঠুর ভাবে নেওয়া উচিত?"

—"ওরা বেঁচে থাকলে আমাদের মারতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। আপনাদের কাজ উদ্ধার হোক, আমারও প্রতিশোধ পূরণ হোক!"

রঞ্জিতের প্রতিবাদ করবার আগেই সে হুকুম দিয়ে দিলে। তারপর যে দৃশ্য হলো, সে অতি মর্ম্মান্তিক!

সব ঘুমন্ত লোককে সেই গুণ্ডার দল পৈশাচিক ভাবে হত্যা করলো, শুধু প্রাণে মারলো না আইনুদ্দিন খাঁকে। তাকে কথামত আধমরা করে ফেলে রাখলো।

অজিতবাবু আইনুদ্দিনের পকেট হাত্‌ড়ে ডায়েরী বার করে নিলেন।

ঐ রকম বিভীষিকাময় রাত্রির পর আবার প্রভাত হলো। সেদিনকার সকাল-বেলাটা সকলের ভাল লাগ্‌ছিল। অজিতবাবু ছুট্‌তে-ছুট্‌তে এসে বললেন,—"চলুন, এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক।"

—"চলুন না! আমরা তো প্রস্তুত। কেবল যেতে পারবে না রাঘব। ও বরং বিশ্রামই করুক, আমরা ততক্ষণ কাজ সেরে আসি।"

যেতে-যেতে রঞ্জিত বললে,—"কাল রাত্রে আপনার মেজাজ্‌ যা দেখেছিলাম! দেখে সত্যি আমারও বড্ড ভয় হয়েছিল।"

—"কি যে বলেন! আসুন, ডায়েরী আর নক্সা বার করুন। এখান থেকেই তো সুরু করতে হবে।"

—"ঠিক বলেছেন। এই তো জমিদার-বাড়ী। এখান থেকে সোজা একশত ফুট। আচ্ছা চলুন, আগে একশ' ফুট যাই।"

প্রায় একশ' ফুট আসতেই অমল বলে উঠ্‌লো,—"এবার কি লেখা আছে?"

—"এবার হচ্ছে একটি ছোট জঙ্গল। হাঁ, ঠিক আছে, জঙ্গলও তো রয়েছে! আসুন, এটাকেও পেরিয়ে যাই।"

জঙ্গলের পর খানিকটা জলাভূমি পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছুলো একটি ছোট পুকুরের ধারে। সেটিও অতিক্রম করে তারা আবার একবার ডায়েরী দেখে নিলে। তাতে লেখা আছে, 'পুষ্করিণীর পর একশ' বর্গ-ফুটের মধ্যে আসল জিনিষ আছে। এইবার নক্সার প্রয়োজন।'

অমল বললো,—"এইবার নক্সা বার কর।"

—"নক্সায় তো আছে একটি মন্দির আর তার বিগ্রহের নিচে একটি গর্ত্ত। চল্, দেখি কোন মন্দির-টন্দির দেখা যায় কিনা!"

সকলে একশো ফুট কেন, প্রায় দেড়শো ফুট খুঁজেও একটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

সকলেই নিরাশায় ভেঙ্গে পড়্লো। রঞ্জিত কিন্তু তখনও বার-বার নক্সাটির দিকে তাকাচ্ছে আর বলছে,—"না, এ কখনও ভুল হতে পারে না! চল্ ঐ বাড়ীটাই দেখি!"

—"আচ্ছা চল্!" না বললে নয়, তাই অজয় বল্লো।

:

বাড়ীটা যে বেশ পুরানো, তা দেখলেই বুঝতে দেরী হয় না।

রঞ্জিত আদেশ দিল,—"যে দরজাটা দেখছিস্, ওটা ভেঙ্গে ফ্যাল্।"

আদেশ দেবার আগেই অজিতবাবু তাতে এক পদাঘাত করে ফেলেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটাও হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো। তার ভিতরে যা দেখা গেল, তাতে আর কারো মুখে কোন কথা ফুটলো না! আনন্দের আতিশয্যে তারা কয়েক মুহূর্ত্ত কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

এই ধ্বংসাবশেষ মন্দিরই বটে! বহুদিনের রৌদ্র-বৃষ্টির ফলে এর এখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তাই মন্দির বলে চেনা একটু কষ্টসাধ্য।

সকলে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলো না। রঞ্জিত অজিতবাবুকে নিয়ে মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহটি নাড়া দিল। বিগ্রহ নড়ে উঠ্‌লো। দু'জনে আস্তে বিগ্রহকে স্থানচ্যুত করে দেখলো—ঠিক বিগ্রহের তলায় খানিকটা গোল জায়গা, লোহার ঢাকনা দিয়ে ঢাকা।

রঞ্জিত সেই ঢাকনা সরাতে চেষ্টা করলো কিন্তু তা সরায় কার সাধ্য ? মরচে ধরে সে এঁটে বসে আছে।

তাদের সঙ্গে শাবলের মত একটি জিনিষ ছিল। তারই সাহায্যে সেই ঢাকাটির চার পাশ খুঁড়ে ঢাকনাটিকে কোন মতে তোলা হলো। ঢাকনাটি তুলতেই একটি গর্ত্ত পাওয়া গেল এবং তার মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল একটি হাতীর দাঁতের বাক্স !

রঞ্জিত সেই বাক্সটি ওপরে তুলে তার মুখ খুলতেই তার চোখ ঝল্‌সে গেল !

সে অজিতবাবুকে বললো, "দেখুন কত ধনরত্ন ! সব পরহস্তগত হচ্ছিল তো ! চলুন, শীগ্‌গির চলুন ! হয়তো আইনুদ্দিন খাঁ এতক্ষণ খাবি খাচ্ছে ! মরবার আগে তার রক্ত-তৃষাটা মিটিয়ে দিতে হবে তো !"

—"ঠিক বলেছেন।"

সকলে এসে জমিদার-বাড়ীর সামনে পৌঁছুলো। রত্নের বাক্স তখন অজয়ের হাতে।

সকলে দেখতে পেলো জমিদার-বাড়ীর রোয়াক বেয়ে

গড়াতে-গড়াতে একজন লোক রাস্তায় নামছে। সে আর কেউ নয়—স্বয়ং আইনুদ্দিন খাঁ, ওরফে সূর্য্যকান্ত সিংহ!

অজয় বললো, "রঞ্জিত, দে ওর রক্ত-তৃষা মিটিয়ে দে।"

রঞ্জিত বাক্স হতে কিছু মোহর বার করে হতবাক্ সূর্য্যবাবুর সামনে ফেলে দিল। সূর্য্যবাবুও তাতে শেষদৃষ্টি রেখে চোখ বন্ধ করলো।

রঞ্জিত বললে, "চল্, ওর রক্ত-তৃষা এ জন্মের মতন মিটে গেছে!"

জমিদার-বাড়ী ছাড়িয়ে তারা যখন এসে মাঠের ওপর পড়লো, অমল তখন গান ধরেছে,—

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে সবে
চল্‌রে দিল্লী চল্,
বাংলার ছেলে বাঙালী আমরা
বক্ষে অমিত বল!"

শেষ